ফুল দিয়ে বলো

- মারিয়ান লেথাম

জুন প্রায়ই বলতো, একজন মানুষ কোন ফুল পছন্দ করে সেটা দেখে তাকে সঠিকভাবে বুঝতে পারবে। অ্যাসিসস্টান্ট সুসান মেনে নিয়েছিল তার মতামত। কারণ কয়েক বছর যাবৎ জুন এই ফুলের দোকানটা চালাচ্ছে।

এই গোলাপের ব্যাপারটাই ধরো, বিশেষ করে হলুদ গোলাপ। এটা যারা পছন্দ করে তারা খুব ভালো মনের মানুষ।

এই মাত্র যে তরুণ হলুদ গোলাপ পাঠানোর জন্য তাদের অনুরোধ করে গেল তাকে উদ্দেশ্য করে জুন বললো।

সুসান অবশ্য এই ভদ্রলোককে উল্টোদিকের রাস্তায় বাসের জন্য অপেক্ষা করতে দেখেছে অনেক দিন যাবৎ।

সেই তরুণ ভদ্রলোক দোকানে ঢুকে গোলাপের দাম জিজ্ঞাসা করেছিল। দাম শোনার পর একটু ম্লান দেখিয়েছিল তাকে।

এই সিজনে এ গোলাপের দাম একটু চড়া। সুসান জানিয়েছিল।

মাথাটা একটু ঝুকিয়ে সে বলেছিল, ঠিক আছে, এই ফুল আমার খুব পছন্দ। তারপর সে আরক্ত মুখে একটা কাগজ সুসানের হাতে ধরিয়ে দিয়েছিল।

কাগজে ঠিকানা এবং যে মেসেজটা যাবে তাও লেখা ছিল।

ভদ্রলোক দোকান থেকে বেরিয়ে যেতেই সুসান মেসেজটি পড়লো।

গতকাল খুব সুন্দর কেটেছে, অনেক ধন্যবাদ।

মেয়েটার নাম সুন্দর। রেচেল। সে কল্পনা করলো রেচেল শান্ত, মিষ্টি এবং বুদ্ধিমতী। যখন মেয়েটা এ ফুলগুলো পাবে তখন সে কি খুশিই না হবে!

জুন তার অ্যাসিসস্টান্টকে বললো, কাস্টমারদের ব্যাপারে একদম ভাববে না। টাকা নেবে আর দেখবে যথাস্থানে ফুল যেন পৌছে যায়। এই আমাদের ডিউটি, এই আমাদের কর্তব্য।

জুন ফুল দিয়ে ফিরে আসতেই সুসান তাকে জিজ্ঞাসা করলো, মেয়েটা খুব পছন্দ করেছে ওই হলুদ গোলাপ, তাই না?

বাসায় ছিল না সে। ওর মাকে দিয়ে এসেছি। জুন বললো।

তিন সপ্তাহ পর তরুণটি এসে আবারও গোলাপের কাছে দাড়ালো। এবার সে অন্য রঙ পছন্দ করলো। কৃম কালার।

মেসেজটা এবার অতোটা সহজ মনে হলো না সুসানের।

আমি তোমাকে ভালোবাসি এবং আশা করছি আবার সব ঠিক হয়ে যাবে।

কাগজে লেখা ছিল।

জুন ফুল নিয়ে বেরিয়ে যেতেই সুসান ভাবলো, এই ফুল পেয়ে মেয়েটার মন নরম হয়ে যাবে এবং নিশ্চয়ই ওদের মিল হয়ে যাবে।

তিন সপ্তাহ পর তরুণ দোকানে আবার ঢুকলো।

গোলাপ? সুসান হাসলো।

না। এবার লিলি পাঠাবো। একটা লাজুক মুখে সে একটা কাগজ দিল।

তাতে অন্য ঠিকানা এবং মেসেজ।

সুন্দর চমৎকার একটি সন্ধ্যার জন্য অজস্র ধন্যবাদ।

রেচেলের জন্য মন খারাপ করলো সুসান।

এই লোকটা এতো তাড়াতাড়ি রেচেল–কে ভুলে গিয়ে অন্য আরেকটা মেয়ের প্রেমে পড়লো!

এই নতুন মেয়েটা কেমন? সুসান ভাবলো, এ মেয়েটা নিশ্চয়ই অলস, বেহিসেবি এবং প্রগলভ টাইপের।

জুন তার মতামতকে স্বীকার করে নিয়ে বললো, যারা লিলি পছন্দ করে তাদের রুচি এক্সপেনসিভ। তারা বেশি খরচ করে। দেখো, এ মেয়ে শিগগিরই আমাদের এ ইয়াং কাস্টমারকে ডোবাবে। ঠিকানা দেখো তার। ধনীদের এলাকার!

জুন এবার দারোয়ানের কাছে ফুল দিয়ে এলো।

সুসান আশা করে বসেছিল মেয়েটা কেমন তা জুনের কাছে জানতে পারবে।

ভাবতে খারাপ লাগছে, এই লোক রেচেল–এর সঙ্গে মিলমিশ করে থাকতে পারলো না। বিষণ্নভাবে সুসান বললো।

তুমি ছেলেদের চেনো না। এরা ভাঙা মন নিয়ে বসে থাকে না বেশি দিন। জুন বললো।

সত্যিই তাই। তরুণটি একদিন এসে আরো লিলি পাঠাতে বললো। এবার কাগজে লেখা, *উইকএন্ডটা খুব ভালো কেটেছে।*

সুসানের মনে হলো, ঘটনাটি খুব তাড়াতাড়ি এগোচ্ছে।

পরেরবার মেসেজ গেল, *যা বলে ফেলেছিলাম তার জন্য আমি দুঃখিত, আমাকে ক্ষমা করো।*

সুসান ভাবলো, আবার বিচ্ছেদ ঘনিয়ে আসছে! যদিও সে আর আশ্চর্য হলো না।

তিন সপ্তাহ চলে যাবার পর সুসান ভাবলো, হয়তো মিলমিশ হয়ে গেছে অথবা হয়তো বিচ্ছেদ। তাই আর ফুল পাঠাতে আসছে না সেই তরুণটি। ইশ, সে যদি আবার রেচেলের কাছে ফিরে যেতো!

জুনের উপদেশ ওর মনে পড়লো। কাস্টমারদের বিষয়ে জড়িয়ে না পড়তে।

এক সপ্তাহ ছুটি কাটিয়ে সুসান যখন ফিরলো তখন জুন বললো, চিন্তা করতে পারো, ফোন করে কে বিয়ের অনুষ্ঠানে বধূর জন্য লিলি ফুলের গোছার অর্ডার দিয়েছে?

বিয়ে? লিলি ফুলের গোছা! সুসান অবাক হলো।

হ্যা, সে তাকেই বিয়ে করছে। খুব তাড়াতাড়ি ঘটে গেল ব্যাপারটা। তাই না? অবাক লাগছে।

সুসান মেনে নিতে পারলো না। সে ভাবছিল আবার হয়তো তরুণটি সেই রেচেলের কাছেই ফিরে যাবে।

অবশ্য তা হলো না। তরুণটি তার নিজের জন্য এবং বিয়েতে তার বন্ধু বেস্টম্যানের জন্য বাটনহোল ফুলের অর্ডার দিল।

সুসান শুভেচ্ছা এবং অভিনন্দন জানিয়ে আবারও ভাবলো, হয়তো শেষ মুহূর্তে বিয়েটা ভেঙেও যেতে পারে।

কিন্তু খবরের কাগজে সে ছবি দেখলো যুগলের। নিজেদের এলাকার কাগজে খুব সুন্দরভাবে বড় করে ছাপা ছবি। তরুণটিকে গর্বিত, সপ্রতিভ দেখাচ্ছে। সুখী চেহারা।

আর মেয়েটি? কালো চুলে তাকে এতো চমৎকার দেখাচ্ছে! লাজুক এবং এতো শান্ত–সুন্দর মেয়েটা!

সুসান ভাবলো, হয়তো উল্টোটাই ঘটেছে এক্ষেত্রে। হয়তো রেচেলই ছিল অলস, খরচে এবং তর্কাতর্কি করতো।

উহ! এই তরুণটি তাহলে বেচে গিয়েছে খুব।

ওর হঠাৎ মনে হলো, জুন মোটেই ঠিক বলেনি ফুলের বিষয়ে।

ফুল দিয়ে মানুষ চেনা যায় না।

অনুবাদ : *জিনাত–ই–হাফিজ*

মারিয়ান লেথাম–এর

Say It With Flowers অবলম্বনে

ইতি তোমার আম্মা

- মাউদুদা খাতুন

প্রিয় জেমী

তোমাকে চিঠি লিখবো এ আমি স্বপ্নেও ভাবিনি। আজ লিখছি, অথচ জানি না এ চিঠি তোমার হাতে পৌছাবে কি না? কেমন আছো তুমি তাও হয়তো কোনোদিনই জানতে পারবা না।

জেমী, তুমি আমার কাছ থেকে চলে যাবে এ আমি স্বপ্নেও ভাবিনি। জেমী, তুমি কি স্বেচ্ছায় চলে গেলে, নাকি কেউ তোমাকে চলে যেতে বাধ্য করলো, নাকি আমিই তোমার চলে যাবার কারণ হলাম? আমি কি তা জানতে পারবো না? তুমি তো যাওয়ার সময় খুবই হাসি-খুশি ছিলে। যাবার মুহূর্তে তুমি আমাকে সালাম করলে।

আমি বললাম, মা, আজ তোমার দুবার সালাম করা হলো।

তুমি মুখে স্বর্গীয় হাসি ছড়িয়ে দিয়ে হেসে ফেললে। সেই তুমি যাওয়ার পরে একটিবারের জন্য কোথায় আছো, কেমন আছো কেন জানালে না, নাকি সেটা জানানো তোমার পক্ষে কোনোভাবেই সম্ভব নয়, কোনো মহাশক্তি কি তোমাকে আমাদেরকে কোনো রকম সংবাদ দেয়া থেকে বিরত রাখছে?

ধর্মীয়ভাবে আমরা বিশ্বাস করি, আমাদের এ দুনিয়ার কৃতকর্মের সব কিছু আমলনামায় লেখা থাকবে যার বিন্দু মাত্র পরিবর্তন করা আমাদের পক্ষে সম্ভব হবে না। হায় আফসোস করলেও না, কাদলেও না, কোনোভাবেই না। আজ তোমার চলে যাওয়ার পর মনে হচ্ছে, তুমি আবার ফিরে এলে আমি কখনো তোমাকে বকবো না। কোনো কাজের জন্য চাপ দেবো না। তুমি যে বিষয় নিয়ে অনার্স পড়তে চাইবে আমি তাতে বাধা দেবো না। তোমার অনার্স পড়ার প্রতি সীমাহীন আগ্রহ জানার পরও কেন যে তাতে সায় দিইনি সেটা ভেবে আমি বর্তমানে চরমভাবে হতাশাগ্রস্ত। অথচ কিছু করতেও সক্ষম হচ্ছি না। যোগাযোগের অভাবে এ ব্যাপারে তোমার সঙ্গে আলাপও করতে পারছি না।

অথচ মা জেমী, তুমি তো জানো, তোমার সঙ্গে আলোচনা, পরামর্শ ছাড়া আমি কতো অসহায়। আমার পরামর্শদাতা যেমন তুমি ছিলে তেমনি আমাকেও তুমি তোমার সকল কাজের পরামর্শকারী বানিয়ে ফেলেছিলে। কিন্তু এখন প্রতিটি কাজে তোমার অনুপস্থিতি এতোটা পীড়াদায়ক ও কষ্টকর হয়ে পড়েছে যে, কোনো কাজে হাত দিতেই আমার আর উৎসাহ লাগে না। সব ইচ্ছা, সব উৎসাহ হারিয়ে ফেলেছি।

জানো জেমী, আমার এখন একটুও রাধতে ইচ্ছা করে না। আমি রাধা-বাড়াতে খুব দক্ষ নই। কিন্তু আমি কোনো কিছু রান্না করলে তুমি *ওয়াও* বলে যেভাবে প্রশংসা করতে তা আর দেখতে পাবো না, শুনতে পাবো না বলে রান্নার সব উৎসাহই হারিয়ে ফেলেছি। অথচ যারা সংসারে আছে তাদের জন্যও আমার কর্তব্য আছে জানার পরও সে কর্তব্য আমাকে দায়িত্বশীল করতে পারছে না। কি করবো আমি? কি করার আছে আমার বলতে পারো জেমী?

তোমার সঙ্গে সকল বিষয়ে একমত পোষণ করলেও তোমার কক্সবাজার যাওয়ার ব্যাপারটিকে সমর্থন করতে পারিনি। তোমার কক্সবাজার যাওয়ার কথা শুনেই না করে দিলাম। তুমি খুবই মনঃক্ষুণ্ন হলে। কিন্তু তুমি তোমার যাবার পারমিশন ঠিকই আদায় করে নিলে তোমার আব্বার কাছ থেকে। তবে আমার প্রতি এ তোমার অবাধ্যতা ছিল না, ছিল তোমার আব্বার কাছে তোমার আবদার। তোমার আব্বা যে তোমার কোনো আবদার অপূর্ণ রাখবেন না এ আমিও যেমন জানতাম তেমনি তুমিও।

অথচ আমি তা জেনেও তোমার যাওয়াতে বাধা দিয়েছিলাম কেন? এ কাজ করা আমার কোনো মতেই উচিত হয়নি। এ বিষয়টি আজ আমাকে দারুণভাবে কষ্ট দিচ্ছে যে, বাধাই যখন দিয়েছিলাম তখন যেতে কেন দিলাম? ফলে তোমার চলে যাওয়া সম্ভব হলো।

তোমার আব্বার কাছে তোমার মোবাইল থেকে কক্সবাজার রওনা হওয়ার আগের মুহূর্তে তুমি টেলিফোন করে তোমার রওনা হওয়ার খবরটি জানালে। তোমার আব্বা স্বার্থপরের মতো তোমার টেলিফোনটি আমাকে না দিয়ে রেখে দিলেন। তোমার সঙ্গে আর আমি কথা বলতে পারলাম না। প্রচণ্ড ইচ্ছা থাকা সত্ত্বেও পিছু ডাকা হবে ভেবে টেলিফোনও করলাম না। কারণ বাসা থেকে রওনা হওয়ার সময় তোমাকে একবার পিছু ডাকা হয়েছিল। তখন থেকেই আমার প্রাণটা ধড়ফড় করছিল। তাই পুনরায় তোমার টেলিফোনের আশায় কান খাড়া করে রাখলাম। রাত বারোটা, নাকি একটার সময় তোমার মোবাইল থেকে ফোন এলো। আমরা কাল বিলম্ব না করে তোমাদের উদ্দেশ্যে রওনা হলাম। তোমরা বিপদে পড়েছো।

পথে যেতে যেতে কতো কথা মনে এলো। তোমরা তিন বোন একই পথের পথিক ছিলে। কে বেশি বিপদগ্রস্ত – ছোটটা, মেজটা, নাকি বড়টা, তোমার কথা চিন্তায় আসামাত্রই তা তুড়ি মেরে উড়িয়ে দিলাম। তুমি পরিপূর্ণ মেয়ে হিসেবে গ্র্যাজুয়েশন শেষ করে মাস্টার্স করার জন্য বাসায় ফরম পূরণ করে রেখেছো। কক্সবাজার থেকে এসেই তোমার ভর্তি হওয়ার কথা। তুমি দীর্ঘাঙ্গী, তোমার শারীরিক শক্তিও যে কোনো একজন সাধারণ পুরুষের চেয়ে বেশি। তুমি ধবধবে ফর্শা। না, ভুল বললাম। শাদার সঙ্গে হলুদের একটা সুন্দর মিশ্রণ আছে তোমার ত্বকের রঙে। তুমি দক্ষ গাড়িচালক। তুমি সদা হাস্যময়ী, তোমার বিশ্বস্ততা, চরিত্র মাধুর্যের কারণে ছোট–বড় সবাই তোমার ওপর নির্ভরশীল। তোমার ছোট বোনের সম্পূর্ণ ভার তোমার ওপর। তা এখনকার জন্যও বটে, ভবিষ্যতের জন্যও বটে। কারণ নিজেদেরকে অর্থাৎ আমাদেরকে তোমার ওপর নির্ভরশীল দেখতে বড় বেশি স্বাচ্ছন্দ বোধ করি আমরা অর্থাৎ তোমার আব্বা ও আমি। তাই তোমার ওপর কোনো ধরনের বিপদ হতে পারে তা মন থেকে একদম মুছে দিয়ে পরম করুণাময় আল্লাহতাআলার কাছে মোনাজাত করলাম, আল্লাহকে তুমি যা ভালো বোঝো করো। তাই পরবর্তীকালে আল্লাহর কাছে আমি কোনো অনুযোগ করতে পারিনি কেন আল্লাহ তুমি এ কাজ করলে বলে। তুমি কি ভাবতে পারছো, আল্লাহ কি খেলা আমার সঙ্গে খেলেছে?

তুমি জানো না জেমী, আল্লাহপাক আরো কতো খেলা খেলেছেন আমাদের সঙ্গে। কেউ কেউ কাকতালীয় বলতে পারে। কিন্তু আমরা তো আল্লাহয় বিশ্বাসী। তাই মনে–প্রাণে বিশ্বাস করি সব কিছুরই নিয়ন্ত্রক আল্লাহ। তা না হলে অতো রাতে তোমার ফুপাতো ভাই কি গাড়ি নিয়ে গাড়ির ড্রাইভারের সঙ্গে বসে বসে গল্প করে! যে গাড়িতে করে তোমাকে নিয়ে আসা হবে তার ব্যবস্থা যদি আল্লাহপাক না করতো তাহলে কিভাবে সেটা সম্ভব হতো!

তোমার ফুপাতো ভাই যেন সংবাদের অপেক্ষাতেই বসে ছিল কখন জেমীর খবর আসবে আর সে মুহূর্তেই রওনা হতে হবে। তোমার আরেক ডা. ফুপাতো ভাই, তার ডিউটি পড়েছিল রাতে। সেও কি খোদার ইচ্ছাতে নয়? আর যে তুমি নিজে সাজগোজ করতে চাইতে না, সামান্য একটা কানের ঝোলান দুল পরলেই বলতে বেশি সাজা হয়ে গেল আম্মা! সেই তুমি কি না তোমার বড় ভাইয়ের বিয়েতে কনের মতো বেনারসি শাড়ি পরে সবাইকে তোমার কনে সাজ দেখিয়ে দিলে! এখানেও একটা আফসোস থেকেই গেল। তোমার জন্য বানিয়ে রাখা সীতাহারটি তোমাকে পরানো হলো না। আহা, যদি পরিয়ে দিতাম!

তবে তুমি শুনে খুশি হবে হয়তো বা তুমি টের পেয়েছো তোমার একটা অপূর্ণ সাধ পূরণ হয়েছে। তুমি মনে–প্রাণে চাইতে আমাদের বাসায় বড় করে একটা মিলাদ শরিফ পড়ানো হোক, তাতে পাড়া–পড়শি আত্মীয়–স্বজনদের ডাকা হোক, দেশ, দশ নিজেদের মঙ্গলের জন্য দোয়া করা হোক। তুমি আমাদের কাছে থাকা অবস্থায় তা না করা হলেও তুমি চলে যাওয়ার পর খুব বড় করে, তুমি ধারণাও করতে পারবে না এতো বিরাট করে মিলাদ শরিফ হয়েছে, দোয়া–দরুদ পড়ানো হয়েছে, কোরআনখানি হয়েছে, এমনকি এতিম–মিসকিনদের পেট ভরে খাওয়ানোও হয়েছে।

আজও সময় এবং সুযোগ পাওয়া মাত্র তা করানো হচ্ছে। তুমি টের পাচ্ছো না?

আচ্ছা জেমী, তোমাকে একটা কথা বলি, তুমি জানতে চেয়েছিলে, মা, ওই শাদা কাগজে তুমি কিসের হিসাব লিখে রাখো?

আমি ধরা পড়ে যাবো ভেবে তোমার কাছে লুকিয়েছিলাম। আজ বলি শোনো। আমি নিজের জন্য কলমা শরিফ, দরুদ শরিফ ও সুরা ইখলাস পড়তাম আর হিসাব রাখতাম। এবং নিজের জন্য রোজার মধ্যে কোরআন শরিফও পড়তাম। আমার মনে হতো, আমি চলে গেলে এগুলো আমার কাজে আসবে। কিন্তু এগুলোর সবই আমি তোমার নামে *তোফা* হিসেবে পাঠিয়েছি। তুমি পেয়েছো জেমী! এটাও কি কাকতালীয় ব্যাপার? তোমার কি মনে হয়!

জেমী, আল্লাহর কাছে আমরা কতো অসহায় দেখো। তুমি নিজের বাসাতে ফিরে এলে, অথচ তুমি আর তোমার প্রিয় বাসায় ঢুকতে পারলে না। তোমাকে পরের খাটিয়ায়, পরের চাদর মুড়ি দিয়ে গারাজে শুয়ে থাকতে হলো। তুমি মুসাফির হয়ে গেলে। আমরা তোমার খবর শুনে বাসায় এসে দেখলাম তুমি গারাজে শুয়ে আছো।

তোমাকে কি বলবো জেমী? কেমন যে লাগলো তা বুঝিয়ে বলার ক্ষমতা আমার নেই। তুমি পর্দানশিন একটা মেয়ে, অথচ গারাজে ভর্তি লোকের চোখের সামনে শুয়ে আছো! এ কি ভাবা যায়? আমরা তোমাকে দেখলাম তুমি ঘুমিয়ে আছো! কি গভীর ঘুম! তোমার লাল ঠোট শাদা হয়ে গেছে। কপালে একটা কাটার দাগ। চোখ বন্ধ। সবাই বলছে, সান্ত্বনা দিচ্ছে, আল্লাহর মাল আল্লাহ নিয়ে গেছে।

আমার মনে হলো, সবাই আল্লাহর বদনাম করছে। আল্লাহ তো জেমীকে আমার কাছে ফিরিয়ে দিয়েছে। কিন্তু আমি কেন তাকে রাখতে পারছি না এতো বড় বাসায়! এতোগুলো ঘরের কোনো একটিতেও কেন তাকে থাকতে দিচ্ছি না। আমি কেন তাকে ঠাণ্ডা-গরম পানিতে গোসল করিয়ে, আতর-লোবান লাগিয়ে গোসল করিয়ে, শাদা কাপড় পরিয়ে লোকেদের কাঠে খাটিয়া চাপিয়ে অন্য জায়গায় চিরদিনের জন্য পাঠিয়ে দিচ্ছি?

জেমী এ কথার কি উত্তর তুমি দেবে? আমিই কি তোমাকে চলে যেতে দিলাম? না, কি তুমি স্বেচ্ছায় বলে গেলে? নাকি কোনো মহাশক্তি তোমাকে তার কাছে এ ভাবেই নিয়ে গেল?

জেমী, মানুষের সব সাধ পূর্ণ হয় না, আমারও হলো না। ইচ্ছা ছিল তোমার বড় বোনের যেমন ফর্শা, সুন্দর, মার্জিত উচ্চ বংশে, ভালো ছেলে দেখে, ইঞ্জিনিয়ার দেখে বিয়ে দিয়েছিলাম, তোমারও তেমনি লম্বা, ফর্শা, সুন্দর, ভালো বংশ ও ডাক্তার দেখে বিয়ে দেবো। কিন্তু সে সাধ পূরণ হলো না। জেমী তোমার জন্য সবাই আমাকে সান্ত্বনা দিচ্ছে। জেমী তুমিই বলো, তুমি নেই এ কথা কি কোনো সান্ত্বনা বা সহানুভূতি দিয়ে ভোলানো সম্ভব?

জেমী, লোকে বলছে, বেহেশতে তোমার নাকি হুরের সঙ্গে বিয়ে হবে, অথচ আমি সে বিয়েতে উপস্থিত থাকবো না। আমি তোমার বিয়ে দেখতে পাবো না একি ভাবা যায়, তবে তুমি যেখানেই থাকো! ভালো থাকো এ কামনা করি। আর বিশ্বাস করি, যতোদিন বেচে থাকবো ততোদিন ইনশাআল্লাহ তোমার প্রতি আমার ভালোবাসা, স্নেহ, মমতা প্রবাহিত থাকবে।

পল্লবী, মিরপুর থেকে

অস্পৃশ্যা

- ফরিদা মনি শহীদুল্লাহ

হঠাৎ এক ধাক্কায় বিধবা হয়ে গেলাম।

কি হলো, কেমন করে হলো কিছু বোঝার আগেই চলে গেল একান্ত কাছের মানুষটি যার সঙ্গে দীর্ঘ চল্লিশ বছর এক সঙ্গে কাটালাম। চোখের পলকে সে নেই হয়ে গেল। মুছে গেল তার অস্তিত্ব। আমার জীবনে রয়ে গেল কিছু স্মৃতি, শুধুই স্মৃতি। সে স্মৃতি কখনো আনন্দের, কখনো বেদনার।

আনন্দ ও বেদনার কাব্য নিয়েই তো জীবন। দাম্পত্য জীবন তো মেঘ–বৃষ্টির খেলা। তবুও এখন মনে হয় বেদনার চেয়ে আনন্দই তো ছিল জীবনে বেশি। মেঘলা আকাশের চেয়ে বেশি ছিল বৃষ্টির আনন্দ ধারায় অবগাহন। তাই এখন শুধু অনুশোচনার পালা। শুধু মনে হয় কেন ওই ক্ষণিক কান্নার ক্ষণগুলোকে আনন্দের ক্ষণে ভরে দিতে পারিনি কেন, কেন? কেন তখন ওই কথাটা শুনলাম না, কেন তখন সে কথাটা বললাম, কেন তখন সে কাজটা করে দিলাম না ইত্যাদি। শুধু কেন, কেন আর কেন ভীমরুলের মতো মনের ভেতর গুমরে ওঠে এবং হুল ফোটায়। দুঃখে, অনুতাপে বুকটা ভেঙে যায়।

যখন মনে হয় আর তো আসবে না লোকটা, কখনোই আসবে না, বকবে না, অনুযোগ করবে না, দুষ্টামির ছলে কখনোই বলবে না, আর পারি না তোমাকে নিয়ে। শুধু শুধু কেন যে চেচাও, ব্লাড প্রেশার বেড়ে যাবে। কিছু হলে আবার আমাকেই তো ডাক্তারের কাছে নিয়ে দৌড়াতে হবে। একটু মুচকি হেসে ঠাট্টা করে বলবে না, আজ মাথায় মনে হয় তেল দেয়া হয়নি, সে জন্যই তো গরম, যাও তেল দাও।

কিংবা যখন মাথা ব্যথায় শুয়ে থাকতাম তখন আমাকে শুনিয়ে শুনিয়ে বাচ্চাদের বলবে না, এই তোদের আম্মা আজ বাইরে যায়নি? ও সে জন্যই তো মাথা ব্যথা করছে। প্যারাসিটামল আছে? না আনতে হবে?

এখন মনে হয় আহারে! যদি এসে এ কথাগুলো আবার বলতো, আদরে–সোহাগে গলে গলে পড়তাম, ভালোবাসায় ভরিয়ে দিতাম তাকে। কিন্তু তখন কথাগুলো যেন গায়ে জ্বালা ধরিয়ে দিতো। পরিহাসের আড়ালে লুকানো স্নেহ–মমতার পরশ অনুভবই করতে পারতাম না। শুধু ব্যঙ্গটাই রক্তাক্ত করে তুলতো হৃদয়। রাগে, অভিমানে শুধু কথা কাটাকাটি, শুধু অহেতুক চেচামেচি। কেন যে এমন হতো, কেন? কেন হতো এমন?

বিধবা তিন অক্ষরের শব্দটি যেন একটি অস্পৃশ্য কিছু! দেখতাম মুরুব্বিরা বিধবাদের দেখে থাকেন অন্য একটি ভিন্ন দৃষ্টি ভঙ্গিতে। মেয়ের গায়ে হলুদে নিকট আত্মীয় বিধবা দাদি কিংবা নানি বা খালা, বোন, মামি, চাচি সে যেই হোক গায়ে হলুদ ছোয়াতে দেন না যেন বিধবা একটি ডেঙ্গু মশা কিংবা ক্যান্সার অথবা কোনো সংক্রামক ব্যাধি যার স্পর্শে আসা অর্থই অভিশাপ আর দুর্ভোগ!

মুরুব্বিরা মেয়েদের সুলক্ষণ, কুলক্ষণ নিয়েও বড় বেশি মাথা ঘামান যেন সব কিছু মিলিয়ে দেখে নিশ্চিন্ত হতে চান। নিজের মেয়েটির কিংবা যে মেয়েকে ঘরে আনবেন সে যেন চিরকাল স্বামী সোহাগিনী থেকে, সধবা থেকেই দুনিয়া থেকে বিদায় নিতে পারে। তাদের কাছে নিময়টাই বড়, লক্ষণটাই বেশি জরুরি বিবেচ্য বিষয়।

তাদের কথায় যে মেয়ের বুড়ো আঙুলের চেয়ে দ্বিতীয় আঙুলটি বড় সে মেয়ে ভাগ্যবতী। যে মেয়ের সামনের দাত একটু উচু, কানের লতি বড় সে মেয়ে খুব কপালওয়ালি। অন্যদিকে যে মেয়ের খড়ম পা, সামনে দাতের মাঝখানে ফাক আর কানের লতি ছোট এবং লাগানো সে মেয়ের বিবাহিত জীবনের সুখ নেই। বৈধব্য দশা তো অবধারিত। এসব শুনে শুনে, দেখে দেখে মনের মধ্যে ভয়ের একটা ঠাণ্ডা স্রোত বয়ে যেতো।

কি জানি কেন আমার স্বামী মেয়েদের সামনের দাত ফাকের ব্যাপার বড় বেশি স্পর্শকাতর ছিলেন। কারো কোনো বিয়ের সম্বন্ধ এলেই সবার প্রথমেই সাবধান করে দিতেন দাতের ব্যাপারে।

শুনে আমারও কেমন ভয় করতো। আয়নার সামনে দাড়িয়ে নিজেকে খুটিয়ে খুটিয়ে দেখতাম। আমার লক্ষণগুলো ভালো তো! আশ্বস্ত হতাম কিছুটা। যাক, মনে হয় কোনো কুলক্ষণের ছায়া নেই আমার মধ্যে।

আজ হাসি পায়! সব কিছুই দেখলাম। কিন্তু কপালের রেখায় যে বৈধব্য যোগ রয়েছে তা তো পড়তে পারিনি। যেমন আমার ছোট মামাতো বোনটি অনেক কিছু মেনে চলেও স্বামীকে ধরে রাখতে পারেনি। কতো কিছু মানতো সে। দুই বিধবার মধ্য খান দিয়ে যাবে না। কারো স্বামী মারা গেলে, বিধবা স্ত্রী প্রথম গোসল করে বের হলে তার মুখ দেখতো না। আমাকেও এসব বিষয়ে কতো উপদেশ দিতো।

আমার বিছানা, বালিশ ছাড়া পরিপাটি করে রাখা দেখলেই বলতো, দিদিমণি, কতো বলেছি, বালিশ ছাড়া বিছানা রাখা ভালো না।

তার কথা শুনলেই হাসতাম। ছেলেমানুষি ভেবে উড়িয়ে দিতাম। কিন্তু এখন ভাবি আমি না হয় মেনে চলিনি, ওতো চলেছে। তবে তার কেন এমন হলো!

অথচ আজ স্পষ্ট মনে পড়ে, মুরুব্বিরা তার মৃত স্বামীকে নিয়ে যাবার আগেই হীরার নাক ফুলটা খুলে ফেলার জন্য কতো পীড়াপীড়ি! দুঃখে, বেদনায় বুকটা ছিড়ে যাচ্ছিল আমার। প্রতিবাদ করেছিলাম বলে উল্টো শুনতো হয়েছিল, তুই কি চাস তার স্বামীর আত্মাটা কষ্ট পাক।

আমার তো মনে হচ্ছিল যে বোনটা আমার এতো সাজতে ভালোবাসতো, কপালে টিপ, হাতভরা কাচের চুড়ি থাকতো, তাকে নিরাভরণ দেখেই (যদি আত্মা সত্যিই দেখতে পায়) কষ্ট পাবে। বলতে পারিনি কিছুই। বলতে পারিনি, পারিবারিক শিক্ষা বাধা দেয় মুরুব্বিদের সঙ্গে তর্কে লিপ্ত হতে। শুধু অসহায়ের মতো দেখেছি আর কেঁদেছি।

এটা করলে ওটা হবে, ওটা করলে সেটা হবে, আধুনিক জগতে এসব মানাটাও একটা হাস্যকর ব্যাপার। কিন্তু একটা বিষয়ে খুবই সাবধান থাকার চেষ্টা করতাম। তা হলো তসবিহ যাতে ছিড়ে না যায়। দোয়া করতে করতে যদি তসবিহ ছিড়ে যায় তাহলে যে কোনো ধরনের অমঙ্গল হতে পারে।

দুঃখজনক হলেও সত্যি, যেদিন আমার স্বামী মারা গেলেন, আগের দিন হাসপাতালে হঠাৎ তসবিহ ছিড়ে দানাগুলো ছড়িয়ে গেল। হঠাৎ অমঙ্গলের আশংকায় কেপে উঠলাম। মনকে প্রবোধ দেয়ার চেষ্টা করলাম। হয়তো সুতো নরম হয়ে গেছে তাই। তবু প্রাণের ভেতর শুধু ধুক ধুক। তিনি ভালো হয়ে যাবেন তো? পারলাম না তাকে বাসায় সুস্থ করে ফিরিয়ে আনতে। আমার একটা কুসংস্কার সারা জীবনটাকে তছনছ করে ছড়িয়ে দিল নিষ্ঠুর পৃথিবীর প্রাঙ্গণে, অসহায় আর নিঃসঙ্গ করে।

মনে বড় কঠিন বিশ্বাস ছিল, আমি কোনোদিন বিধবা হবো না। কারণ আমার নানি কিংবা খালা তাদের স্বামীর আগেই চলে গেছেন। আমার আব্বার যদিও বয়স নব্বই বছরের উপরে আর আম্মার আশি এবং আব্বা হাটতেই পারেন না ভালো করে। কিন্তু আম্মার বিশ্বাস, আব্বাকে তিনি বিপত্নীক করেই যাবেন।

তবে আমার বিশ্বাসের কারণ ছিল অন্য। ভাষাবিদ ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহ আমার নানা। এবং যেহেতু আমার স্বামীর নাম শহীদুল্লাহ, শুধু সে জন্যই আমার বিয়ে তার সঙ্গে হয়েছিল। আমি বাবা মায়ের একমাত্র সন্তান। তাদের অনেক আশা আমাকে নিয়ে, সুপিরিয়র সার্ভিস পরীক্ষা দেবো, চাকরি করবো ইত্যাদি।

যেহেতু একমাত্র মেয়ে, অনেক প্রস্তাব আসতো এবং যথা নিয়মে আম্মা আব্বার ওই একই উত্তর, মেয়ে ছোট। তাছাড়া একটাই তো সন্তান। এতো তাড়াতাড়ি পরের বাড়ি পাঠাতে চাই না।

অথচ সেই আম্মার যে কি হলো! বরের নাম শুনে পাগল হয়ে গেলেন। আমার বাবার নামে নাম এ ছেলের সঙ্গেই মনির বিয়ে দেবো। ভালো হবে।

তারপর এসএসসি পরীক্ষার পরেই বিয়ে দিয়ে দিলেন। সবচেয়ে মজার কথা, আমার শ্বশুর নাকি নানা ভাইয়ের নাম শুনেই আমার স্বামীর নাম রেখেছিলেন যাতে তিনিও জীবনের নামকরা কেউ হতে পারেন।

নানি সব সময় বলতে তুই আর আমি মিতা। তোর স্বামী এবং আমার জনের একই নাম।

তাই দৃঢ় বিশ্বাস ছিল মিতার মতো আমারও কপাল হবে। তিনি মিসেস শহীদুল্লাহ, আমিও তাই। ভাগ্য তো একই হওয়া উচিত ছিল। নানাভাইয়া প্যারালাইজড হয়ে এক বছর শয্যাগত। কিন্তু বাবুমণি আত্মবিশ্বাসের সঙ্গে বলতেন, আমি বিধবা হবো না।

সত্যিই তাই হলো। কয়েক ঘন্টার মধ্যে মস্তিষ্কের রক্তক্ষরণে তিনি সবাইকে ছেড়ে চলে গেলেন।

নানাভাইয়াকে হুইল চেয়ারে করে কবরস্থানে নিয়ে যাওয়া হলে তিনি জড়ানো কণ্ঠে বলেছিলেন, আমার সাজানো বাগান শুকিয়ে গেল।

সাজানো বাগান তো শুকিয়ে গেল আমার। বাবুমণির মতো কেন হলো না! ভাবি আর ওই কথাটাই বিশ্বাস করতে চেষ্টা করি, জন্মের সঙ্গেই মানুষ তার ভাগ্যরেখা নিয়েই আসে। মুসলমান হওয়ার পূর্ব শর্ত হলে ইমান ঠিক রাখা এবং তকদিরে বিশ্বাস করা। কাজেই এতো সব কুসংস্কারের বেড়াজালে আটকে না থেকে Man proposes and God disposes এই অমোঘ বাক্যে বিশ্বাসী থাকাই জীবনে সুখী হওয়া, শান্তি পাওয়ার একমাত্র পথ।

তবু বিধবা।

তিন অক্ষরে ত্রিশূল, মর্মান্তিক যাতনায় কাউকে পলে পলে বিধতে পারে, রক্তাক্ত করতে পারে, বুঝিনি। অন্যের বৈধব্য দশায় দুঃখ পেয়েছি, সমবেদনা জানিয়েছি। দোয়া করেছি। কিন্তু এ বিবর্ণ রূপহীন জীবনের কষ্টটা বুঝিনি। মনে হয় কবর থেকে তুলে আনি লোকটাকে। বলি, তোমার রেখে যাওয়া সব কিছুর সমাধান করে দিয়ে যাও, না হয় স্পষ্ট করে দিয়ে যাও, আর না পারো তো সঙ্গে করে নিয়ে যাও।

একটা মানুষ যে ছিল সংসারের কেন্দ্রবিন্দু, সে চোখ বন্ধ করার সঙ্গে সঙ্গে পৃথিবীটা কেমন করে বদলে যায়। চেনা মানুষ হয়ে যায় অচেনা। হাজার সমস্যার জালে জড়িয়ে প্রাণান্তকর হয় জীবন। বুঝলাম বড় নিদারুণভাবে। হৃদয়ঙ্গম করলাম। প্রতিক্ষণে বুঝতে পারছি স্বামী নামের ব্যক্তি বিহীন জীবনতরী বেয়ে যাওয়া বিধবার পক্ষে কতো যে কঠিন। তার চোখ বন্ধ করার সঙ্গে সঙ্গে মুহূর্তে চারপাশ অন্ধকার হয়ে সেই যে ডুবে গেলাম গভীর থেকে গভীরতম কোনো অতল অন্ধকারে তার থেকে বেরিয়ে আসার পথ কি?

জানি না কোথায়!

আব্বা সব সময় বলেন, Time is the best healer. সময়ে সব সয়ে যায়, সব ভুলিয়ে দেয়।

তাই কি?

দেখতে দেখতে এক বছর পার হয়ে গেল। মনে হয় এই তো সেদিন! লোকে লোকারণ্য, তার আত্মা যেন কষ্ট না পায়। তাই নাকি বার বার কেদে কেদে সবাইকে অনুরোধ করেছি, হাতের চুড়ি দুটো খুলে নিয়ে শাদা শাড়ি পরিয়ে দিতে। শুধু মনে পড়ে, আমার দুর্ভাগ্যের ছায়া যাতে কাউকে স্পর্শ না করে সে জন্য মনে–প্রাণে চেয়েছিলাম নিজেকে আড়াল করে রাখতে।

আমি বিধবা, আমি বিধবা কথাগুলোর কষাঘাতে জর্জরিত হয়ে বাইরে যেতে পারিনি বহুদিন। তিন মাস দশ দিন পর চাকরির তাগিদে যখন বাইরে বের হলাম, মনে হতো নিজেকে অস্পৃশ্য আজব এক মানুষ। মনে হতো সবাই কেমন কৃপার দৃষ্টিতে দেখছে আমাকে।

কথা বলতে ইচ্ছা করতো না। কথায় কথায় চোখের সামনে সব ঝাপসা হয়ে যেতো। অশ্রুর কুয়াশায় ভাবতে পারিনি কোনোদিন স্বাভাবিক হতে পারবো। হাসতে পারবো কোনোদিন। কিন্তু জীবন সংগ্রাম আমাকে দাড়

করালো এক নির্মম বাস্তবের মুখোমুখি। সন্তানদের বাবার স্নেহ এবং মায়ের মমতা দিয়ে, ছায়া দিয়ে রাখতে হবে আমায়। চোখের জল মুছি আর কাজ করে যাই।

তার জমিয়ে রাখা ফেলে যাওয়া সমস্যার পাহাড় সমাধান করতে গিয়ে দিশেহারা। এখনো পর্যন্ত তার পেনশনটাও ঠিক করতে পারিনি। তিনি ছিলেন একজন উচু পদের সরকারি আমলা। তারও পেনশন ঠিক করার জন্য নাকি বড় অংকের পারিতোষিক দিতে হবে আমাকে।। কি নিষ্ঠুর এই পৃথিবী! আরো কঠোর হৃদয় মানুষের, অবাক হয়ে দেখি। শুনেছি বহু। কিন্তু এখন নিজের জীবন দিয়ে উপলব্ধি করছি।

আমি বিধবা। আমার বাচ্চারা এতিম, তাতে কি? শুধু শুনি, সবাই নাকি তার কাছে অনেক কিছুই পাবে। অথচ আজ পর্যন্ত একজন এসে বললো না, এই একটা টাকা শহীদুল্লাহ আমার কাছে পেতেন। এই নিন ঋণ শোধ দিলাম।

বড় দুঃখে হাসি পায়। চল্লিশটি বছর বাস্তবতার মুখোমুখি হইনি কখনো। বাবা মায়ের ছিলাম আদরের। স্বামীর কাছেও তাই। কোনো সমস্যা কিংবা ঝামেলা কোনোদিন তিনি আমাকে বুঝতে দেননি। কিন্তু আজ?

শোক সামলে উঠতে না উঠতেই দেখলাম স্বামীর গ্রামের অনেক নিকট আত্মীয় যারা বুক চাপড়ে কেদেকেটে তাকে কবরে শোয়ালো তারাই এক সপ্তাহের মধ্যেই হাসিল করে নিল অনেক কিছু। জমিজমা, টাকা, পয়সা সবই বেহাত। জানি, এগুলো উদ্ধার করার ক্ষমতা আমার নেই। কারণ আমার পেশিশক্তি নেই। কিন্তু মনে বল আছে আমার, আল্লাহ আছে। *হাসবুনল্লাহ ওয়া নেয়ামাল ওয়াকিল ওয়া নেয়ামাল মাওলা ওয়া নেয়ামাল ওয়াকিল* (আল্লাহই আমাদের জন্য যথেষ্ট)।

ঈমানের বলে বলীয়ান হয়ে পথ চলছি। সবাইকেই বলি, পারিবারিক কলহ পরিহার করো। সহজভাবে নিতে শেখো অনেক কিছুই। সংসারের ভার দুজনে মিলে নিতে চেষ্টা করো। তবে একজনের বিহনে অন্যজনের কষ্ট হবে না। যেমনটি কষ্ট ভোগ করতে হয় সকলকেই, বিশেষ করে বিধবাদের, ভুক্তভোগী আমি এবং আমার মতো আরো অনেককেই।

হারিয়ে যাওয়া সে উষ্ণ আশ্রয় যার বুকে মাথা রেখে পাওয়া যেতো পরম শান্তি, ভোলা যেতো সব উদ্বেগ আর ব্যথা-বেদনা, বলা যেতো নির্ভয়ে আমি তোমায়...। নেই। সে নেই। নেই পরম প্রিয় মানুষটি। মনের মাঝে ঘুঘু পাখির ডাক নিঃসঙ্গতার বেদনা জাগায়। চৈত্রের শুকনো বাতাস স্মৃতিগুলো উড়িয়ে দিয়ে শুধু বয়ে যায়। আর বয়ে যায়।

শুধু হু হু করে মনের ভেতর।

গুলশান, ঢাকা থেকে

যুদ্ধের যিশু

- দিলরুবা শাহানা

কাজের সূত্রে মাঝে মধ্যে মেডিকাল পেশায় জড়িত লোকজনের সঙ্গে আমার দেখা-সাক্ষাৎ হয়। তেমনি একজন হচ্ছেন স্পেশালিস্ট ড. জেইন। একদিন জেইনকে যখন তার রোগী নিনার কথাগুলো ইংরেজিতে বলছি তখন ঘটলো ওই ঘটনা।

কেউ চেম্বারে ঢুকে ফাইল ক্যাবিনেট থেকে জরুরি কিছু নিতে এসেছিল। চলে যেতে যেতে কথা শুনে ফিরে তাকালো, ততোক্ষণে জেইনের কথা নিনাকে তার ভাষায় ব্যাখ্যা করছি, দুই পা এগিয়ে এসে ছেলেটি দাড়ালো। কথা শেষ হতেই জেইনের দিকে তাকিয়ে *এক্সিউজ মি* বলে আমাকে প্রশ্ন করলো আবার নিজেই উত্তরও বের করে ফেললো।

ইজ ইট ইওর মাদার টাং? ইট ইজ নট। অ্যাম আই রাইট?

আমার চামড়ার রঙয়ের সঙ্গে মুখের ভাষার মিল নেই এটা বুঝে গেছে। মাথা দোলালাম।

ড. জেইন সময় বাচানোর জন্য বলে উঠলেন, আমাদের কাজটা শেষ করতে দাও, এরপর তুমি তার সঙ্গে কথা বলতে পারো।

আমার দিকে তাকিয়ে জেইন বলেন, আমিই সিবাস্টিয়ানকে তোমার কথা বলেছিলাম। তার সঙ্গে কথা বলে তুমি তার রহস্য বের করতে পারো কি না দেখো।

আমার যেমন মুখের ভাষাটা চামড়ার রঙয়ের সঙ্গে মেলেনি বলে সে বিস্মিত।

আমারও খটকা লাগলো তার চামড়ার রঙয়ের সঙ্গে চুল আর চোখের রঙয়ের অমিল দেখে।

একটু পরেই যখন রুম থেকে বাইরে পা রাখলাম, দেখি করিডোরের আরেক মাথা থেকে সিবাস্টিয়ান নামের ছেলেটি আসছে।

আমাকে দেখে সে দ্রুত পা চালালো। কাছে এসে হাত বাড়িয়ে দিয়ে বললো, আমি সিলবাস্টিয়ান গ্রান্ট আর জেইন বলেছে তুমি মাল্টিলিংগুয়াল।

দুটো ভাষা জানলে যদি কাউকে মাল্টিলিংগুয়াল বলা যায় তাহলে ধরে নাও তাই।

দুটো ভাষা যে বলতে পারো নিজেই দেখলাম, মায়ের ভাষা যে এ দুটোর একটাও নয়, তাও আন্দাজ করছি। মাতৃভাষাটা জানো তো? কি সেটা?

কথাটা শুনে কেমন একটা ঝাঝ চলে এলো। বললাম, কেন জানবো না? ইংরেজির মতো বাংলা সহজ নয়, কঠিন। তবু সুন্দর ভাষা।

তাই তো জেইন বলেছে ঠিক কথা। মাল্টিলিংগুয়াল, শুধু বিলিংগুয়াল না। কিছু মনে করো না। তোমাদের মতো অনেকে ইংরেজিটা জানলে নিজের ভাষাটা বলেই না বা শিখেই না। কি জানি, পাছে উচ্চারণ নষ্ট হয়ে যায় তাতে!

চামড়া তোমার শাদা হলেও তোমারও কোথায় যেন আলাদা কিছু আছে।

এই আলাদা কিছুর গল্প হবে। জেইন বলেছে, তুমি কিসব নিয়ে যেন গবেষণা করো।

আমি ভাবছিলাম জেইন কেন বলেছে আমার কথা। জেইন বিশ বছর ধরে মেডিকাল স্পেশালিস্ট হিসেবে কাজ করছে। তার আগে তাকে গাদা গাদা পড়াশোনা করতে হয়েছে স্পেশালিস্ট হওয়ার জন্য। এখন পর্যন্ত প্রফেশনে আপ টু ডেট থাকার জন্য পড়েই যাচ্ছে।

তাকে একদিন বলেছিলাম, তোমার ধৈর্য অনেক! এতো পড়াশোনা করো কি করে?

তোমারও ধৈর্য আছে। না হলে এতোগুলো ভাষা শিখতে পারতে না। আমি জানি একটা মাত্র ভাষা ইংরেজি, তাও ততো ভালো না।

জেইনকে বলিনি যে, ফ্রেঞ্চ শিখতে গিয়েছিলাম। ওই ভাষার ‘র’ উচ্চারণ করতে গিয়ে যখন জিভ, আলজিভ দুটোই ব্যথা হলো তখন সে আশা বাদ। স্প্যানিশ ভাষাতে চোদ্দটা টেন্স না থাকলে উচ্চারণে আটকাতে পারতো না। তবে ওই টেন্সের যন্ত্রণা থেকে যতো দূরে থাকা যায় ততোই ভালো।

সিবাস্টিয়ানকে তার নাম শুনে মনে হলো জার্মান।

জিজ্ঞাসা করতেই বললো, আমার মা অস্ট্রিয়ান, বাবা ইংরেজ আর আমি? বলবো না। দেখি তুমি আন্দাজ করতে পারো কি না।

একটু ধাধায় পড়ে গেলাম।

ছেলেটি তখন বললো, সময় থাকলে চলো ওইখানে বসে কফি খাওয়া যাক।

কোণায় একটি কফি শপে আমরা গিয়ে বসলাম। বেশ কিছু সময় কথাবার্তা হলো। আমার অনুসন্ধিৎষ্ণু মন তার রহস্য জানতে অস্থির হলেও বাইরে এক নির্লিপ্ত ভাব ফুটিয়ে রাখলাম।

সিবাস্টিয়ানের ছোটবেলা কেটেছে ইংল্যান্ডে। মা নার্স আর বাবা ছিলেন স্কুলের আর্ট টিচার। তার যখন বছর বারো বয়স, বাবা এক সড়ক দুর্ঘটনায় মারা যান। তার বছর দেড়েক পর তার মা চাকরি নিয়ে অস্ট্রেলিয়াতে চলে আসে। সেই থেকে তারা এখানেই আছে। নার্স হিসেবে জেইনের সঙ্গে কাজ করেছে। জেইনের সঙ্গে বন্ধুত্ব হয়ে গিয়েছিল ধীরে ধীরে। সিবাস্টিয়ানকে খুব যত্ন করে, আদরে মানুষ করেছেন মা। নাইট ক্লাব বা ডান্স পার্টি ইত্যাদিতে আগ্রহ ছিল না তার মায়ের। শখ ছিল সিনেমা, থিয়েটার দেখা আর প্রাকৃতিক সৌন্দর্যের ভাণ্ডার খুজে বেড়ানো।

একবার এক পাহাড়ি নদীর কাছে গিয়ে সুন্দর এক পাথরের ওপর বসতে বসতে বলেছিলেন, ইশ! তোর বাবা এখানে আসতে পারলে খুব খুশি হতেন।

তখন সিবাস্টিয়ানের ষোল বছর হয়ে গেছে। কিছু কিছু জিনিস বুঝতে শিখেছে। তখনই সে বুঝলো, বাবার জন্য মায়ের হাহাকার স্থায়ী হয়ে গেছে।

ছোটবেলা ছুটির দিনে নদী এবং সমুদ্রের কাছে কতো বেড়াতে যেতেন। বাবা ছবি আকতেন, মা আর সে কখনো সাতার কাটতো, বল ছোড়াছুড়ি করে খেলতো কখনো।

খাবারের আয়োজনে লাগলে বাবা এসে হাত লাগাতেন। সালাড কাটতেন বাবা। সব সময় টমাটো, গাজর দিয়ে ফুল কেটে রাখতেন মায়ের প্লেটে। শশা, গাজর দিয়ে মাছ বানিয়ে রাখতেন সিবাস্টিয়ানের প্লেটে।

স্কুলের দিন শেষ হয়ে এলো। ছাত্র, শিক্ষক ও অভিভাবকের ডিনারে মা এলেন। তখন একটা বিষয়ে কেউ কেউ প্রশ্ন করলো বেশ কৌতূহল নিয়ে যাতে তার মনেও খটকাটা লাগলো তখনি। অ্যালবামে বাবা মায়ের সঙ্গে ছবিগুলো খুটিয়ে খুটিয়ে দেখছিল আর ভাবছিল আশ্চর্য তো! আমি কোথা থেকে এলাম এদের কাছে?

কি ছবি দেখছিস অতো মন দিয়ে?

জানো মা, স্কুলে সবাই বলছিল তোমার সঙ্গে আমার কোনো মিলই নেই আর এখন দেখতে পাচ্ছি বাবার কোনো কিছুও আমি পাইনি। আমি তাহলে কার মতো দেখতে মা?

মা ব্যাপারটাকে পাত্তাই দিলেন না। হেসে বললেন, কার মতো আবার? আমার মতো। আমার মতো ফর্শা, আমার মতো চিকন, লম্বা।

আমিও পড়া শেষ করলাম মাও অসুস্থ হতে শুরু করলো। প্রচুর রক্তের দরকার হলো। রক্ত দিতে গিয়ে দেখলাম গ্রুপ মিললো না। শুধু রক্ত নয়, আরো অনেক কিছুই মেলেনি। মায়ের দিন ফুরিয়ে আসছিল।

একদিন তার হাতে হাত বুলাতে বোলাতে বললাম, তোমার কিছুই আমার মাঝে নেই। না তোমার চুল, না তোমার নাক–চোখ, এমনকি রক্তের গ্রুপও নয়।

তার ফ্যাকাশে শীর্ণ মুখে উজ্জ্বল চোখ ঠিকরে মায়াময় এক আলো ছড়ালো। আমার ভালোবাসা তোর মাঝে আছে আর থাকবেও। তবে তোকে আমার কিছু বলার আছে।

ওই দিনের মতো কথা শেষ হলো। সিবাস্টিয়ান মেডিকাল ইনফরমেশন ম্যানেজমেন্টের ওপর পিএইচডি করছে। কার সঙ্গে তাকে এ ব্যাপারে তথ্য জোগাড়ে যেতে হবে।

আরেকবার দেখা করার দিনক্ষণ ঠিক করে উঠলাম।

আমার শুধু একটাই ভাবনা ঘোরে মাথায়। আমাকে কেন সে এতো কথা শোনাচ্ছে? চার সপ্তাহ সময় কবে শেষ হবে যখন ভাবছি তখন একটা ফোন এলো।

হ্যালো।

আমি সিবাস্টিয়ান, সিবাস্টিয়ান গ্রান্ট।

বুঝতে পেরেছি, পৃথিবীতে সিবাস্টিয়ান নামে একজনকেই চিনি যে হলো তুমি। কি ব্যাপার?

তুমি কি আজ বিকালে চারটার দিকে ওই কফি শপে একবার আসতে পারবে?

আমি ঘটনার শেষ জানতে খুব আগ্রহী আবার এদিকে নিজের বাচ্চাটাকেও স্কুল থেকে আনতে হবে। দোটানায় পড়ে গেলাম। আচ্ছা, সময়টা সাড়ে চারটা হলে কেমন হয়?

ঠিক আছে, টেলিফোনেও কথা বলা যাবে। তবে আমি তোমাকে কিছু দেখাবো বলে এনেছি। অবশ্যই আসবে।

তাকে বাসায় আসতে বললে সে হয়তো আসতো। তবে চাই না স্বল্প জানা একজনকে খালি বাড়িতে ডেকে আনতে। ভাবছিলাম সে কি আমাকে দেখাতে চায়।

মোটামুটি সব কাজ গুছিয়ে সাড়ে চারটায় কফি শপে পৌছে দেখি সে অপেক্ষা করছে।

আমরা একপাশে টেবিল নিয়ে বসলাম।

সিবাস্টিয়ান একটি প্যাকেট টেবিলে রেখে কাউন্টার থেকে কফি আনতে গেল।

আমি তাকে দেখছিলাম। ফ্যাকাশে ফর্শা সে নয়, মাখনের মতো মসৃণ ফর্শা। চুলের রং ঘোর কালো। তবে চোখগুলো খয়েরি মতো। লম্বা একহারা গড়ন। আজকে তাকে সুখী মনে হচ্ছে খুব।

টেবিলে কফি রাখতে রাখতে বললো, আজকে আমাকে কনগ্রাচুলেট করতে পারো।

কি ব্যাপার?

পরশু ইংল্যান্ড যাচ্ছি স্কলারশিপ নিয়ে। কৃতিত্ব জেইনের। সে আমার স্কলারশিপ জোগাড়ে সাহায্য করেছে।

অভিনন্দন জানাই। তাই তো বলি হঠাৎ করে তুমি আজ কেন ডেকেছো।

কফির সঙ্গে শুরু হলো গল্প। এই গল্পের আসরে একাই আমি শ্রোতা।

আমাকে চমকে দিয়ে এবার সে বললো, জানো, আমি বাংলাদেশি!

মানে তোমার জন্ম বাংলাদেশে। তাহলেও জন্মসূত্রে নাগরিকত্ব বাংলাদেশ দেয় না, এই আইন আমি ভালো জানি।

আসলে আমাকে বাংলাদেশ থেকে এডাপ্ট করে এনেছিলেন আমার মা।

ওহ... বুঝেছি।

ঠোটের কাছ থেকে কথাগুলোকে মুখের ভেতরে নিয়ে গিলে ফেললাম। বাংলাদেশে যে সর্বসাধারণের জন্য দত্তক নেয়ার আইন নেই তা ভালোভাবে জানি। এও জানি, মুক্তিযুদ্ধের পর সরকার Abandoned Childrens Act (পরিত্যক্ত শিশু আইন) জারি করেছিল। এর আওতায় বিদেশিরা অনেক পরিত্যক্ত বাচ্চাকে লালন পালনের জন্য বিদেশে নিয়ে যায়। মনে মনে ভাবলাম, এই ছেলেটি তাদের কেউ একজন হয়তো। হতে পারে, নাও হতে পারে। সে ফর্শা। তবে শাদাদের মতো লাবণ্যহীন ফর্শা নয়। চুল এবং চোখ তার শ্বেতাঙ্গদের মতোই নয়।

গল্প চলে।

রেড ক্রসের সঙ্গে বাংলাদেশে কাজ করতে যান অস্ট্রিয়ান নার্স হেলেন বালার্ড। ওখানে মিশনারিদের এক হাসপাতালে অসুস্থ, স্মৃতিভ্রষ্ট, তার উপর গর্ভবর্তী এক নারীকে তিনি দেখেন। কোথা থেকে সে এসেছে, কার সে কন্যা, কার সে স্ত্রী কেউই জানে না। হালকা-পাতলা, ফর্শা, লম্বা সে হতভাগী পিঠে দীর্ঘ কালো চুল ছড়িয়ে হাটুতে থুতনি রেখে বসে থাকতো শূন্য দৃষ্টিতে। কোনো প্রত্যাশা ছিল না। বোধহয় কোনো যন্ত্রণাও ছিল না। ওই চাহনিতে শুধু ছিল শূন্যতা, অপার শূন্যতা। বোধহয় যুদ্ধ তার সব কেড়ে নিয়েছিল। কেড়ে নিয়েছিল তার স্বজন, তার নিরাপত্তা, তার স্মৃতি, নাকি আরো কিছু? তবে এই ব্যাপারে কেউ নিশ্চিত ছিল না।

হেলেনের খুব মায়া পড়ে গেল মেয়েটির জন্য।

তবে বেশি দিন ওই স্নেহ ভোগের জন্য রইলো না সে। সন্তান জন্মানোর পর পরই সিলিং ফ্যানে ফাস লাগিয়ে আত্মহত্যা করে। তার বেচে থাকার অপেক্ষায় কেউ ছিল না। তাই মৃত্যুই পরম মমতায় সব কষ্ট থেকে তাকে মুক্তি দিল।

হেলেন এসে দেখলেন মেয়েটি সন্তানকে রেখে পৃথিবী ছেড়ে চলে গেছে। হেলেনের মনে পড়লো, তিনি এসে যখন একটি হাত মেয়েটির চুলে রাখতেন তখন মেয়েটি দুই হাতে হেলেনের অন্য হাতটি আকড়ে ধরে অসহায় চোখে দেখতো। সহজে হাতটা ছাড়তে চাইতো না। ওই চোখে কোন আকুতি ছিল হেলেন বোঝেননি। তবে বাচ্চাটাকে দেখার পর মনে হলো ওই বাচ্চাকে তারই দেখতে হবে। তিনি চেষ্টা করেছিলেন খোজখবর বের করতে।

নানানজনের কাছ থেকে টুকরো খবর পান। মেয়েটি সম্ভ্রান্ত বাড়ির বৌ। বাপের বাড়ি এসেছিল গর্ভবতী অবস্থায় যত্ন ও আদরে থাকবে বলে। মুক্তিযোদ্ধার খোজে পাকসেনারা এলাকায় অত্যাচারের ঝড় বইয়ে দিয়েছিল। ঝড় থামলে অনেকের সঙ্গে মেয়েটিকেও আধমরা অবস্থায় এলাকার স্কুল ঘর থেকে উদ্ধার করা হয়। মেয়েটির বেচে যাওয়া আত্মীয়রা ইনডিয়ায় পাড়ি জমায়। তাদের সংস্কার, তাদের মানবিক, মমতা ও ভালোবাসাকে হত্যা করেছিল। তাই ওই হতভাগীর আশ্রয় জোটে মিশনারিদের হাসপাতালে।

হেলেন অনেক ঝামেলা করে বাচ্চাটাকে নিয়ে আসতে পারেন। তবে স্মৃতি হিসেবে কিছুই জোগাড় করে আনতে পারেননি। শুধু আমার মায়ের হাতের এ দুটো চুড়ি ছাড়া।

কথা শেষ করে সিবাস্টিয়ান টেবিলে রাখা প্যাকেট থেকে গোল শান্তিনিকেতনি চামড়ার কৌটাটি বের করলো। ঢাকনা খুলে কৌটাটি আমার দিকে এগিয়ে দিল।

হাতে নিয়ে দেখি দুটি শাখা রয়েছে তাতে। বিবাহিতা বাঙালি হিন্দু মেয়ের অনেক যত্নের ধন শাখাসিদুর।

সিবাস্টিয়ান গভীর মমতায় শাখাগুলোর দিকে তাকিয়ে থেকে বললো, আমার গর্ভধারিণী বোধহয় আমাকে এক নজর দেখার জন্যই লাঞ্ছনা, কষ্ট সহ্য করে আমার জন্ম পর্যন্ত বেচেছিলেন।

এবার তাকে জিজ্ঞাসা করলাম, আচ্ছা, তোমার কি কখনো বাবার কথা জানতে ইচ্ছে করে না?

কথা শেষ হওয়ার সঙ্গে সে তর্জনি তুলে ঠোটে বেকিয়ে বললো, শ...শ

তারপর বললো, মা (হেলেন) যখন অসুস্থ, একই কথা আমিও মায়ের কাছে জানতে চেয়েছিলাম।

মা তখন পৃথিবীর সেরা সুন্দর কথা বলেছিলেন, যিশুর বাবা ছিল না, যুদ্ধের সন্তানেরাও যিশুর মতো। তুমিও আমার যুদ্ধের যিশু।

মেলবোর্ন, অস্ট্রেলিয়া থেকে
manzur@netspace.net.au

ক্রেইজি গার্ল

– শামসুল হক হাওলাদার

নিজের চেহারা–সুরত কোনোকালেই ভালো ছিল না। এ নিয়ে মন খারাপও কম করিনি। কেন, নায়ক মার্কা একটা চেহারা আমাকে দিলে আল্লাহর কি এমন ক্ষতি হতো? নাঈম, সালমান শাহরা যখন শাবনূর, মৌসুমীদের নিয়ে ঘুরে বেড়ায় তখন ওই সব দৃশ্য দেখে ঢাকার চব্বিশ তলা বিল্ডিংয়ের ওপর থেকে লাফ দিয়ে পড়তে ইচ্ছা করে।

আজকাল কোনো উপন্যাস পড়ে মজা পাই না। সেখানে নায়কের চেহারা থাকে খুবই সুন্দর। সুন্দরীরা তাদের একবার দেখেই প্রেমে পড়ে যায়।

কলেজে আমার যেসব বন্ধুদের চেহারা সুন্দর তারা এক সঙ্গে দুই তিনটা মেয়ের সঙ্গেও প্রেম করে। অনেকে ধরা পড়ে ত্রিশংকু প্রেমের ভেজালেও জড়িয়ে গেছে। শালার আমার হলো পোড়া কপাল। তিনজন তো দূরের কথা, একজনের কাছেও ঘেষতে পারলাম না এ জীবনে।

মনটা আমার সব সময়ই মরা মরা থাকে। পেপারে প্রেমিক-প্রেমিকাদের পালিয়ে যাওয়ার খবর পেলে ওই খবরটা আগে পড়ি। নায়িকার বাবা নায়িকাকে নিয়ে যেতে চায়। কিন্তু নায়িকা নায়ককে ছেড়ে যাবে না। সে বাবাকে বলে, তোমাকে আমি চিনি না। তুমি আমার কেউ না, আমি তাকে ছেড়ে কোথাও যাবো না। আমি তাকে ভালোবাসি।

তখন আমার নিজের মাথায় চুলই ছিড়ে ফেলতে ইচ্ছা করে। তারপরও পেপার পড়তে হয়, বেচে থাকতে হয়।

এমনি যখন আমার মনের অবস্থা তখন একদিন কলেজের বিজয় দিবস অনুষ্ঠানে গেলাম। এসব অনুষ্ঠানে ছেলেমেয়েরা একটু বেশি ফৃ হয়। কিন্তু কলেজে ছাত্রছাত্রী বেশি আসেনি। তিনজন স্যার কলেজের বকুল তলায় বিজয় দিবস পালন করার জন্য সমবেত হয়েছেন। অন্য স্যারেরা বাসায় বসে টিভি দেখছেন অথবা বাচ্চা-কাচ্চা রাখছেন। কয়েক বছর আগেও এসব অনুষ্ঠান জাকজমকের সঙ্গে হতো। এখন যে, মনে হয় দায়সারা ভাব।

অনুষ্ঠানের হালহকিকত দেখে আর ওই দিকে গেলাম না। স্যারদের চোখে পড়লে আবার জোর করে বসিয়ে রাখবেন। তাই সামনে আর না এগিয়ে পেছন থেকে কেটে পড়লাম। ইছাপুরা চৌরাস্তায় এসে দেখি আমার নিচের ক্লাসের একটি মোটা মেয়ে দাড়িয়ে আছে।

তাকে প্রায়ই এদিকটায় ভাবলেশহীনভাবে দাড়িয়ে থাকতে দেখি। কিন্তু কথা বলতে মন টানে না। নিজের চেহারা যাই হোক, সুন্দরী মেয়ে না হলে কথা বলে মজা পাওয়া যায় না।

আমার এক বন্ধু বলতো, দোস্ত, সুন্দরী মেয়েরা অহংকারী হয় বেশি, একটু অসুন্দর মেয়েরা আন্তরিক হয় বেশি।

তবে আমার পছন্দ সব সময়ই চাপাকলা গাছের মতো ছিপছিপে যাদের দেহের গড়ন ওই সব মেয়েদের।

যেমন আমাদের থার্ড ইয়ারের তপতী রায়। হালকা-পাতলা, ছিপছিপে গড়ন। অন্য ধর্মের হলে হবে কি? এক এক সময় মন চায় নিজের জাত-কূল-মান বিসর্জন দিয়ে মৃত্যুঞ্জয়ের মতো ঝুলে পড়ি। কিন্তু আমার তো মৃত্যুঞ্জয়ের মতো অতো সাহস নেই।

সেই যাই হোক। মেয়েটাকে সাহস করে বললাম, কোথায় যাবে?

সে বললো,বাসায় যাবো।

বললাম, চলো উপজেলায় যাই। সেখানে বিজয় দিবসের অনুষ্ঠান আছে।

এ কথায় মেয়েটা রাজি হয়ে যাবে তা ভাবিনি।

সঙ্গে সঙ্গে তাকে নিয়ে এক রিকশায় উঠলাম। রিকশায় তো জায়গা হয় না।

ভানু বন্দোপাধ্যায়ের একটি কৌতুক মনে পড়লো। গিন্নিকে নিয়ে বাবু বেড়াতে যাবেন। এখন গিন্নি রিকশায় বসার পর আর বাবুর বসার জায়গা নেই। গিন্নি ছিল এমন মুটকি।

শেষে রিকশাচালক বলে, বাবু, আপনি মাইজির কোলে বসেন।

এখন আমার হয়েছে সেই দশা।

কোনো মতে চেপেচুপে বসেছি। ওজন মনে হয় তিন মনের কম হবে না।

রিকশাচালক বার দুয়েক পেছন ফিরে তাকিয়ে আবার জীবনপণ করে টানতে থাকে।

প্রচণ্ড রোদ, ভাবলাম রিকশার হুড টেনে নিই। কিন্তু না, কোনো মতেই হুড ফেলা গেল না মোটার কারণে। কৌতুক করে বললাম, কি টায়ার লাগাইছেন ভাই?

রিকশাচালক মুচকি হাসলো।
রিকশায় বসে বেশ মজাই লাগছিল।
হঠাৎ বুঝলাম সে আমার হাত ধরে আঙুলে চাপ দিচ্ছে।
খুব পুলক বোধ করলাম। চান্স পেয়ে তার হাত চেপে ধরলাম। তারপর কখন যে উপজেলায় এসে পড়েছি তা খেয়াল নেই।
এখানেও কোনো লোকজন বেশি নেই। ভলিবল খেলা হচ্ছে। মুক্তিযোদ্ধা একাদশ বনাম টিএনও একাদশ।
সুজানাকে বললাম, তুমি চলে যাও, আমার যেতে একটু দেরি হবে।
আসলে তার সঙ্গে যেতে চাইছিলাম না। এমন মোটা মেয়েকে নিয়ে ঘুরতে আমার লজ্জা করছিল।
কিন্তু সুজানা একা যেতে চাইছে না। সুজানা বললো, সুমনভাইয়া, আপনি আমাকে বাসায় নিয়ে চলেন।
হাতে অনেক সময় আছে। ভাবলাম আজ বিজয় দিবস তাকে নিয়ে রিকশায় ঘুরে বেড়ালে কেমন হয়। মোটে কেউ আমার সঙ্গে আসে না। হোক না মোটা। মেয়ে তো! বললাম, চলো রিকশায় ঘুরে বেড়াই।
সুজানা বললো, চলুন।
আগে জানতাম হালকা-পাতলা মেয়েরা সেক্সি হয়। সুজানা মোটা হওয়া সত্ত্বেও তাকে খুব সেক্সি মনে হচ্ছে।
সুজানাকেও মনে হয় মোটা দেখে কেউ পোছে না। তাই আমার সঙ্গে যেতে রাজি হয়েছে।
সে যাই হোক। আমরা রিকশায় মজা করে ঘুরে বেড়াচ্ছি।
আমার এক বন্ধু বলেছিল, মেয়েদের উরুর ওপর হাত রাখলেই বোঝা যাবে সে সেক্সি কি না।
উরুতে হাত রাখবো কি না সাত-পাচ ভাবছি। এক সময় আবিষ্কার করলাম আমার হাত তার উরুর উপর।
সুজানা বললো, সুমনভাই হাত সরান। পরে সামাল দিতে পারবেন না। আমার শরীরে সুড়সুড়ি বেশি। আপনি আমার হাত ধরার পর দেখেন আমার হাত কেমন ঘেমে গেছে।
বললাম, কেন, ঘামলো কেন?
সে বললো, কি জানি? আমার এখন কেমন যেন উত্তেজনা লাগছে। আসলে আমি কোনো পুরুষ মানুষের সঙ্গে এভাবে ঘনিষ্ঠ হয়ে কখনো বসিনি তো, হয়তো তাই।
লক্ষণ বেগতিক দেখে তার উরু থেকে হাত সরিয়ে নিলাম। হাত সরিয়ে নেয়ার সময় আমার হাতের কনুই তার সুবিশাল স্তনে একটু ধাক্কা খেল। কিন্তু সে কিছুই মনে করলো না বুঝতে পারলাম। ধাক্কাটা এমনিতেই দিয়েছিলাম না মনের অজান্তে লেগেছিল তা আজ আর মনে নেই। কিন্তু এটুকুতেই বেশ আনন্দ পেয়েছিলাম।
পর দিন ইংরেজি ক্লাসে যাবো। দেখি সুজানা কলেজের বারান্দায় দাড়িয়ে আছে।
আমাকে বললো, সুমনভাইয়া চলুন আজ ঘুরতে যাই।
এমনিতেই ইংরেজি ভালো বুঝি না। গতবার ফেল করে ইজ্জত খুইয়েছি। এবার যদি ফেল করি লজ্জার সীমা থাকবে না। তারপরও তার আহ্বানকে উপেক্ষা করতে পারলাম না। জানতাম *ন্যাড়া বেলতলায় একবারই যায়*। কিন্তু এ দেখি বার বার যেতে চায়।
ইংরেজিস্যারের চোখ ফাকি দিয়ে আজও বেরিয়ে পড়লাম রিকশা ভ্রমণে।
আজ আমি কিছুই করছি না। আজ সব কিছু করছে সুজানা।
রিকশায় উঠেই সে আমার হাতের পাঞ্জা ধরে তাতে একটু আলতো করে চুমু খেলো।
ভাবলাম এটা সৌজন্যবোধ। তারপর ইচ্ছা করেই আমার গায়ের শাদা জামাটায় কাধ বরাবর একটু চুমু একে দিল। অবশেষে রিকশাচালকের চোখকে ফাকি দিয়ে আলতো করে আমার ঠোটে ঠোট রাখলো।
অবশ হয়ে গেলাম।
যখন সংবিৎ ফিরে পেলাম, রিকশাচালাককে বললাম, রিকশা ঘোরাও।

সুজানা অবাক হয়ে বললো, কি ব্যাপার? রিকশা ঘোরাচ্ছেন কেন?
মিথ্যা বললাম, আমার বাড়িতে একটা জরুরি কাজ আছে। আগে আমার মনে ছিল না।
রাস্তা ভরা মানুষ। এর মধ্যে সে ঢঙ করে আমার কাধে মাথা হেলান দিয়ে বসেছে।
মাথা সরিয়ে দিলাম।
তারপর আমাকে জড়িয়ে ধরে বসলো।
নির্জন রাস্তা হলে এভাবে বসলে বেশ মজা হতো। লোকে দেখলে বলবে কি?
সুজানাকে সোজা হয়ে বসতে বলে বললাম, কেউ দেখে ফেলবে।
সুজানা বললো, দেখুক তো। আপনি ভয় পান সুমনভাইয়া? ছিঃ, ছিঃ, মেয়ে মানুষের মতো কাপছেন কেন?
কাপুনি থামাতে চেষ্টা করলাম। কিন্তু থামছে না। মেয়েমানুষ আমার দুর্বলতা বুঝে ফেলবে তাই বললাম, কাপছি না। একটু আনইজি লাগছে।
সুজানা বললো, আপনি আমাকে ভালোবাসেন?
কোনো সন্দেহ আছে?
সিনেমায় নায়ক-নায়িকারা কতো ক্লোজ হয়ে বসে, হাত ধরে নাচে। আরো কতো কি সব করে। তাহলে আমরা পারবো না কেন?
আমি কি করে সুজানাকে বোঝাই, আমাদের জীবনটা সিনেমা নয়। বাস্তব বড় কঠিন। ভালো চেহারা পাওয়া ও নায়ক হওয়ার শখ মিটে গেছে। এখন *ছেড়ে দে মা কেঁদে বাচি* অবস্থা আমার। আগে জানতাম চিকন মেয়েরা ক্রেইজি গার্ল হয়, এখন দেখছি ভুটকিরাও কম নয়।
আসলে সবই ভুল। তবে সুজানাকে জীবনে কোনোদিন ভুলতে পারবো না।

ঠিকানা বিহীন

ছিনতাই

– আবদুর রহিম

ঘটনাটি ২০০০ সালের। সবে মাত্র এসএসসি পাস করে ঢাকায় ফার্মগেটে তেজগাও কলেজে সায়েন্সে ভর্তি হয়েছি। কিছু দিন যাওয়ার পর জানতে পারলাম আমার বন্ধু জাকিও ঢাকা কলেজে চান্স পেয়েছে।
উল্লেখ্য, কলেজে ভর্তির সময় ছাড়া ঢাকায় আমার কখনো তেমন আসা-যাওয়া হয়নি। ফলে রাস্তাঘাট চেনাও সম্ভব নয়। তাই জাকিই ফার্মগেট আসতো আমার সঙ্গে দেখা করার জন্য। প্রতিবার কলেজের পাশে অবস্থিত অত্যন্ত ব্যস্ত মার্কেট মাহবুব প্লাজার দোতলায় দুজনের সাক্ষাৎ হতো। এমনিতে হই চই, হট্টগোল আমার একদম পছন্দ নয় এবং কলেজের সময় থেকে শুরু করে সন্ধ্যা পর্যন্ত এই মার্কেটটি অত্যন্ত ব্যস্ত থাকে। তাই তাকে বললাম কোনো পার্কে গিয়ে বসতে।
তখন সে বললো সংসদ ভবন চত্বরে গিয়ে বসতে।
তাই সঙ্গে চললাম। নতুন বলে চিনি না। এক সময় পৌছে দুজনেই সংসদের পাশে টানেলের মধ্য দিয়ে বেরিয়ে সংসদের শেষ সীমানায় গিয়ে বসলাম।
উল্লেখ্য, তখন সকাল এগারোটা বাজলেও ওই পাশে যেমন হই হট্টগোল রয়েছে। ওই অনুপাতে এই পাশটায় অত্যন্ত নীরব ছিল। তখন বসে দুজনে আলাপ শুরু করলাম। আমাদের নিত্য আলাপের একটি কমন বিষয় ছিল হিন্দি সিনেমা। এবং ওই দিন আমরা শাহরুখ খান অভিনীত মোহাব্বাতে সিনেমা সম্পর্কে আলাপ করছিলাম।

হঠাৎ দেখি পার্শ্ববর্তী নীরব রাস্তা থেকে একজন পয়ত্রিশ সাইত্রিশ বছর বয়সী যুবক এসে আমাদের জিজ্ঞাসা করলেন, তোমরা কি রাজধানী হাই স্কুলের ছাত্র?

উল্লেখ্য, তখন আমার পরনে কলেজের ড্রেস শাদা শার্ট, নেভি ব্লু প্যান্ট। তা সত্ত্বেও এ ধরনের উল্টো–পাল্টা প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করার কোনো অর্থ খুজে পেলাম না। তা সত্ত্বেও জাকি জিজ্ঞাসা করে বসলো, তার এ প্রশ্ন করার কারণ কি?

তখন ওই যুবকটি বললো তার বোনকে নাকি রাজধানী স্কুলের কিছু ছাত্র টিজ করেছে।

তখন জাকি বললো, আমাদের কাছে কলেজের পরিচয়পত্র রয়েছে। চাইলে তিনি দেখতে পারেন।

এরপর পরই জিজ্ঞাসা করলেন, তোমাদের মধ্যে মানিব্যাগ কে ব্যবহার করে।

জাকি মানিব্যাগ ব্যবহার করে না। কিন্তু আমি করি। অত্যন্ত সরলভাবে জাকি বলে দিল যে, সে অর্থাৎ আমি ব্যবহার করি।

খেয়াল করিনি ততোক্ষণে রাস্তার ওই পাশ থেকে আরো চারজন যুবক এসে পড়েছে। ওদের একজন আগের যুবককে জিজ্ঞাসা করলো, বড়ভাই কি হয়েছে?

তিনি জবাব দিলেন, সীমাকে যে ছেলেগুলো উত্যক্ত করতো তাদের পেয়েছি।

এ কথা শুনে দুজনে যেন আকাশ থেকে পড়লাম। আজকে নির্ঘাত ধোলাই। কথা বলতে বলতে তারা এ পাশে এসে দুই বন্ধুকে ঘিরে বসে পড়লো।

আমার পাশেরজন বসেই বললো, দেখে তো ভদ্রলোকের ছেলে মনে হয়। কাজ তো বেশ অভদ্রের করো।

আমি তখন ভয়ে অস্থির। কেননা জীবনে আর কখনো এ পরিস্থিতির মধ্যে পড়িনি।

তার কথা শেষ না হতে আরেকজন বলে উঠলো, এতো নাটক করার কি দরকার যা আছে, নিয়ে নে।

এবার জাকির কলেজের ব্যাগের ওপর দিয়ে একটি খাপে তার এক মাসের টিউশন ফি যা স্যারকে দেবে বলে ঘর থেকে এনেছে তা নিয়ে নিল। সঙ্গে তার একটি অডিও ক্যাসেট ও একটি ভিডিও সিডি ছিল। তাও নিয়ে নিল। আমার পাশে বসা ছেলেটি আমার হাত থেকে আমার দামি ক্যাসিও ডেটা ব্যাংক ঘড়িটি খুলে নিল।

আমি দিচ্ছি না দেখে সে আমার হাতে বিকট এক কামড় দিল।

তারপর ছিড়ে সে আমার ঘড়িটি নিয়ে নিল।

এবার আমার মূল ভয়ের পালা। প্রথমে জাকিকে তারা জিজ্ঞাসা করেছিল মানিব্যাগের কথা। তখনই মনে পড়লো, এই বুঝি হাত দিল। কিন্তু না।

আমার ঘড়ির সঙ্গে শার্টের উপরে থাকা সত্তর টাকা নেয়ার পর দুজনকে বিশ টাকা দিয়ে বললো, যাও লক্ষ্মী ছেলেদের মতো বাড়ি যাও।

এ বলে ওরা দৌড়ে হাওয়া।

পরে জাকিকে মিরপুরের বাসে তুলে দিয়ে নিজে মেসে ফিরে এলাম।

আমাদের পরবর্তী দেখার তারিখে দুজনে বসলাম ক্ষতির পরিমাণ হিসাব করতে। তার নগদ পাচশ এবং একটি অডিও ক্যাসেট ও ভিসিডি মিলিয়ে মোট প্রায় সাড়ে ছয়শ টাকা। আমার কাছ থেকে নেয়া সত্তর টাকা ও ঘড়িটি মিলিয়ে প্রায় হাজার টাকা লোকসান হলো।

জাকি বললো, তোর ক্ষতি বেশি হয়ে গেল।

চিন্তা করলাম, সত্তর টাকা তেমন কিছু নয় এবং প্রবাসী বাবাকে বললে এ ধরনর আরেকটি ঘড়ি পাঠিয়ে দেবেন। ফলে তেমন ক্ষতি হয়নি। তবে বার বার একটি ঘটনায় বেশ হাসি পাচ্ছিল এবং তা হলো, ঘড়ি না খুলতে দেয়ায় ছিনতাইকারীর কামড় হাতের অত্যন্ত গভীরে বসে গিয়েছিল। তার মরিয়া হয়ে ঘড়ি খুলতে গিয়ে ঘড়ি ছিড়ে দেয়া পর্যন্ত হাসি পাচ্ছিল।

তাড়াহুড়োর কারণে ছিনতাইকারীরা আমার মানিব্যাগের কথা ভুলে গিয়েছিল যাতে নগদ প্রায় পাচ হাজার টাকা ছিল এটা আমার খালুকে দেয়ার জন্য বাবা পাঠিয়েছিলেন। ওই টাকায় হাত গেলে আমার দুরবস্থা হতো।

ধন্যবাদ দিতে হয় জাকিকে তার দিকে ছিনতাইকারীদের খেয়াল বেশি থাকায় আমার মানিব্যাগের কথা তারা ভুলে গিয়েছিল।

আল আইন থেকে

rahim7335318@yahoo.com

প্রবাসীর বিয়ে

- রাশেদ বিন কালাম

সম্প্রতি আমি দেশ থেকে ছুটি কাটিয়ে এসেছি। দীর্ঘ চার বছর পর দেশে গিয়ে অনেক আনন্দ করেছি। অবশ্য ছুটিতে যাবার মূল উদ্দেশ্য ছিল ছোট বোনের বিয়ে। আল্লাহপাকের অশেষ রহমত, আমি থাকা অবস্থায় সেটি সম্পন্ন হয়েছে। তাই আনন্দও একটু বেশি হয়েছে। বিশেষ করে আমরা কাজিনরা বেশি মজা করেছি।

যাক, বোনের পর প্রসঙ্গক্রমে আমার বিয়ের ব্যাপারে ঘরে আলোচনা শুরু হলো। সবাই মোটামুটিভাবে আমাকে বিয়ের ব্যাপারে ইনসিস্ট করতে লাগলো। তাছাড়া ঘরের বড় ছেলে হিসেবে, দুই বোনের বিয়ের পর শূন্য ঘরে একটি বৌয়ের প্রয়োজন এটা আমাকে বোঝাতে চেষ্টা করছে সবাই।

তবে বিয়ের ব্যাপারে আমার কোনো প্ল্যান ছিল না। এবার নয়, আগামী ছুটিতে বিয়ে করবো এই প্ল্যান ছিল আমার। মনের মধ্যে একটা ভয় কাজ করতো সব সময়। কারণ ইদানীং মেয়েরা এবং অভিভাবকরা পাত্র হিসেবে প্রবাসীদের পছন্দ করে না। বিশেষ করে মিডল ইস্টে যারা আছেন তাদের সমস্যা হয় বেশি। যেহেতু আমি কাতারে থাকি, তাই আমার মধ্যেও প্রবাসী ভীতি কাজ করে সব সময়।

দেশে থাকা অবস্থা কয়েকজন বন্ধুসহ অনেকের বিয়ে করাতে গিয়ে বুঝতে পারলাম মেয়েরা প্রবাসী বর বললে নাক সিটকায়। অনেকের মতে, প্রবাসে অবস্থানের চেয়ে দেশে অবস্থানরত অনেক নিম্ন আয়ের লোক বর হিসেবে তাদের কাছে অগ্রগণ্য। তাহলে আমার প্রশ্ন, প্রবাসীরা কি বিয়ে করতে পারবে না? অনেক সময় দেখা যায়, এখান থেকে নির্দিষ্ট দুই তিন মাসের ছুটিতে গিয়ে অনেক খোজাখুজির পর মনের মতো পাত্রী না পেয়ে ফেরত এসেছেন অনেকে। দুঃখের বিষয় হচ্ছে, দীর্ঘ দিন প্রবাসে কাটানোর পর প্রায় লক্ষাধিক টাকা খরচ করে দেশে গিয়ে যদি এই পরিস্থিতির শিকার হতে হয় তাহলে বলার কিছু থাকে না।

আমরা যারা প্রবাসী তাদের পদে পদে সমস্যা। দেশে গেলে বাজারে গিয়ে কিছু কিনলে দোকানিরা টাকা নেয় একটু বেশি, গাড়িতে উঠলে ড্রাইভার ভাড়া চায় বেশি। তাছাড়া চাদাবাজিসহ নানান সমস্যায় কাটাতে হয় পুরোটা সময়। তার ওপর কেউ যদি বিয়ে করতে যায় তাহলে তো *মরার উপর খড়ার ঘা*।

এই প্রবণতা চট্টগ্রামে একটু বেশি। তাই আমরা যারা চট্টগ্রামের আছি তাদের জন্য এটি যুদ্ধ জয়ের মতো একটি ব্যাপার। এছাড়া বিয়ে কোনো পুতুল খেলা নয়, অনেক ভেবে-চিন্তা এই দীর্ঘ মেয়াদী সিদ্ধান্তটি নিতে হয়।

বর্তমানে স্কুল, কলেজের মেয়েরা প্রবাসী বরদের পাত্তাই দিতে চায় না। কিন্তু আমরা দেখি, দেশের প্রধানমন্ত্রী থেকে শুরু করে উচুস্তরের সবাই প্রবাসীদের জন্য সহানুভূতি দেখান, জাতীয় অর্থনীতিতে প্রবাসীদের অবদান অনস্বীকার্য এ কথা সবাই এক বাক্যে স্বীকার করেন।

আমার ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা থেকে দেখেছি, এবার ছুটিতে গিয়ে আমার পছন্দের মানুষটির সামনে যেতে কেমন যেন সংকোচ লাগছিল। তাছাড়া আমার বোনদের কাছে জানতে পারলাম তাদের পরিবার আমাকে আন্ডারএসটিমেট করে শুধু একটি কারণে। সেটি হলো, আমি প্রবাসী। তাই কোনো সংঘাতে না গিয়ে ফেরত

এসেছি মনের মধ্যে চাপা কষ্ট নিয়ে। আমার কাছে আমার পরিবার যেমন সবার আগে, নিশ্চয় তার কাছেও তার পরিবারের সিদ্ধান্তটা মেনে নিতে হবে। অবশেষে এই কূলে তুমি আর ওই কূলে আমি মাঝখানে...।

আমার ভাবতে কষ্ট হয়। গত চার বছর আগে যখন দেশে ছিলাম, বাবার ব্যবসার পাশাপাশি মডেলিংয়ের সঙ্গে জড়িত ছিলাম। আমার নির্দিষ্ট কোনো আয় ছিল না, ভবিষ্যৎ কোনো স্থায়ী পরিকল্পনা ছিল না। তারপরও মেয়েদের কাছে পাত্র হিসেবে অগ্রগণ্য ছিলাম। আর এখন আমার নির্দিষ্ট আয় আছে, সুন্দর ভবিষ্যৎ–পরিকল্পনা আছে, তারপরও নিজেকে মনের মানুষের সামনে উপস্থাপন করতে পারছি না। এবং সেও তার গণ্ডি থেকে বের হতে পারছে না।

বর্তমানে আমার মতো অনেকেই এ সামাজিক একঘেয়েমির শিকার।

তবে এ কথাও সত্যি যে, অনেক প্রবাসীরাও এখানে খুব ভালো চাকরি করে। অনেক টাকা আয় এবং নানান মিথ্যা কথা বলে বিয়ে করে অনেক মেয়ের সর্বনাশ করেছে। আমি একতরফাভাবে প্রবাসীদের সাফাই গাইতে চাই না। তেমনিভাবে অভিভাবক ও পাত্রীদের বলতে চাই, সব প্রবাসীদের এক পাল্লায় মাপা ঠিক নয়।

বর্তমানে মেয়েদের ধারণা, প্রবাসী মানে এক শ্রেণীর আনকালচার্ড লোক যারা দেশে কিছু করতে না পেরে বিদেশে অবস্থান করছে। তাদের এই ধারণা পরিহার করা উচিত। আমরা যারা প্রবাসে অবস্থান করছি তারা মোটামুটিভাবে সবাই প্রতিষ্ঠিত। নিজের আয়ের ওপর নির্ভর করে। সবার নিজস্ব নির্ভরযোগ্যতা আছে। যোগ্যতা আছে নিজের পরিবার ও স্ত্রীকে ভালোভাবে চালানোর। তাহলে তো মেয়েদের বরং বেশি খুশি হওয়া উচিত। কারণ তার স্বামী একজন আত্মনির্ভরশীল মানুষ এবং সময় মতো যতোটুকু সম্ভব তার চাহিদা পূরণ করতে সক্ষম। তাকে নিয়ে অহংকার করা যায়, ঘৃণা নয়। আমার বিশ্বাস, বর্তমান তথাকথিত স্মার্ট মেয়েদের শুভ বুদ্ধির উদয় হবে।

আমরা প্রবাসীরা সবাই *কোথাও কেউ নেই*–এর সেই মুনাকে আশা করি যে কি না মৃত্যুর দুয়ারে দোল খাওয়া বাকেরভাইকে নিয়ে নতুন জীবনের স্বপ্ন দেখে। একজন সত্যিকারের মুনাই পারে একজন প্রবাসীকে সঠিক দিকনির্দেশনা দিতে। মা–বাবা, ভাই–বোন, স্ত্রী, পুত্র–কন্যা নিয়ে সুখের সংসার করতে প্রত্যেক প্রবাসীর একজন মুনার বিশেষ প্রয়োজন। কারণ প্রবাসীদের এখানে আন্তর্জাতিক বাজারে অনেক প্রলোভন অতিক্রম করে চলতে হয়। অনেক সময় সঠিক দিকনির্দেশনার অভাবে অনেক কিছু হারিয়ে যায় তার নির্দিষ্ট রাস্তা থেকে।

তাই আমাদের ভবিষ্যৎ সুন্দর ও সুশৃঙ্খল করার জন্য কি আমরা একজন মুনা আশা করতে পারি না? নাকি দুঃখ ভারাক্রান্ত হৃদয় নিয়ে লিখতে হবে –

আমরা সবাই বাকের হবো
এতো মুনা কোথায় পাবো।

দোহা, কাতার থেকে
rashed_bin_kalam@yahoo.com

সেরা পোশাক

- মোহাম্মদ শাহজাহান

হুশ–জ্ঞান হয়েছে পর্যন্ত দেখেছি মুরুব্বিরা সব সময় শাড়ি পরেন। স্কুলে শিক্ষিকা, পাড়ার খালাম্মা এবং বিবাহিতা বড়আপা সবাইকে শাড়িতেই দেখেছি। সে জন্যে শাড়ির প্রতি যে দুর্বলতার সৃষ্টি হয় তার সমাপ্তি ঘটে শাড়িকে সৌন্দর্যের প্রতীক রূপে মনে স্থান দিয়ে।

তখন কচি মনে শাড়ি সম্বন্ধে এ ধারণাটাই বদ্ধমূল হয়ে গিয়েছিল যে, সেটা শুধুই বিবাহিতা নারীদের জন্যে নির্দিষ্ট। ছোটবেলা থেকেই শহরে মানুষ হয়েছি বলেই হয়তো শাড়ি সম্বন্ধে আমার ওই একপেশে ধারণা গড়ে

উঠেছিল। পরবর্তীকালে যদিও গ্রামের বাড়িতে গিয়ে অবিবাহিতা কিশোরীদেরও শাড়িতে দেখেছি তবু আজও কেন জানি শাড়িকে বিবাহিতা নারীর ভূষণ ভাবতেই বেশি ভালোবাসি।

এ শাড়ি ঘিরে ছোটবেলার একটি অম্লমধুর স্মৃতি আজও মনে দোলা দিয়ে যায়। তখন ক্লাস এইট–এ পড়ি। বড় বোনের বিয়ে ঠিক হলো। বরপক্ষ বিয়ের কেনাকাটা করবে বলে আমাকে সঙ্গে নিলেন বিয়ের শাড়ি পছন্দ করতে। বাজারে গিয়ে আমি সবুজ রঙা একখানা বেনারসি শাড়ি পছন্দ করলাম।

উপস্থিত সবার ভোটে ওই শাড়িটিই কেনা হলো।

আমার পছন্দ করা শাড়ি একবাক্যে সবাই পছন্দ করেছে দেখে মনে মনে বেশ পুলকিত হলাম। কিন্তু গোল বাধলো অন্যত্র। শাড়ি নিয়ে বাসায় এলে ছোট–বড় সবাই মন্তব্য করলো, বিয়ের শাড়ি হবে লাল রঙের। বোকাটা কি শাড়ি পছন্দ করেছে দেখো।

তাদের মন্তব্য শুনে আমার এতোক্ষণকার আনন্দ নিমেষেই উবে গেল। তবে পরে এই বলে মনকে প্রবোধ দিয়েছিলাম যে, যাহোক, শাড়িটা আর বদল করা হয়নি এবং বিয়ের দিন আপুকে ওই শাড়িতে বেশ অপূর্বই লাগছিল। শাড়ির রঙ নিয়ে অতঃপর কেউ আর উচ্চবাচ্য করেনি।

এটা ছিল ১৯৭০ সালের কথা। কর্মসূত্রে আমরা তখন করাচি নিবাসী।

স্বাধীনতা সংগ্রামের প্রাক্কালে দুলাভাই ও বড়আপা ছুটি কাটানোর জন্যে বাংলাদেশে (তৎকালিন পূর্ব পাকিস্তানে) গিয়ে আর ফেরত যেতে পারেননি। স্বাধীনতার পরে আমরাও এক সময় মাতৃভূমিতে ফিরে আসি। আপার শ্বশুরবাড়ি বেড়াতে গিয়ে তার সুটকেসে সেই বিয়ের শাড়ি ও আরো কিছু দামি শাড়ি আবিষ্কার করে আরেকবার পুলকিত হয়েছিলাম।

এটা ছিল সেই ১৯৭৪ সনের কথা। অথচ যুদ্ধের কঠিন দিনগুলোতে বর্ডারের কাছাকাছি অবস্থান হবার কারণে তাদেরকে ঘরবাড়ি ছেড়ে কলকাতা, আগরতলা পালিয়ে বেড়াতে হয়েছিল। পরবর্তীকালে বাড়ি ফিরে এসে তাদের অনেক মূল্যবান জিনিসপত্র খুজে না পেলেও আপা তার বিয়ের শাড়িসহ সুটকেসটি ঠিকই ফেরত পেয়েছিলেন।

শাড়িই আমার প্রিয় পোশাক, মানে আমার গৃহিণীকে শাড়িতে দেখতেই বেশি পছন্দ করি। কিন্তু যাকে শাড়ি পরিয়ে তার সৌন্দর্য সুধা দুই নয়নে উপভোগ করবো সেই মনমোহিনীর শাড়ি পরনে ভীষণ অনীহা। সে সালোয়ার–কামিজে থাকতে ও কাজ করতে বেশি স্বাচ্ছন্দ বোধ করে। অবশ্য ঈদ পার্বনে, বিয়ে–শাদির অনুষ্ঠানে কিংবা কোনো নিমন্ত্রণ রক্ষায় গেলে অবশ্যই তার শাড়ি পরা চাই এবং সে শাড়ি হতে হবে অনন্য, হাজারে একটা। বুঝুন ঠ্যালা।

তাই শাড়ি নিয়মিত না পরলেও তার আলমারিতে ঝলমলে মূল্যবান শাড়ির কোনো কমতি নেই। কখনো শাড়ি কেনার বায়না ধরলে সহজে নাও করা যায় না। কারণ বেকে বসে বলবে, কেন, তুমিই না আমাকে শাড়িতে দেখতে চাও। অথচ শাড়ি কিনতে বললেই তোমার তখন নানান রকম টালবাহানা।

গিন্নির অগোচরে একটা কথা বলে রাখি, সে সব কিছুতেই একটু বেশি যত্নশীল। তাই তার কাছে শাড়ি কাপড়ের দিন যায় ভালো। তার আলমারিতে যে সব শাড়ি আছে তার অর্ধেকের বয়স সতেরো আঠারো বছর। অর্থাৎ আমাদের বিয়ের বয়সের সমান। যদিও শাড়ি কেনার ব্যাপারে সে একটু চুজি তবুও তার ওই গুণের কারণে ঈদ পার্বনে কখনো আত্মীয়স্বজনকে দেয় শাড়ি কাপড়ের বাজেটে টান পড়লে তখন গিন্নির শাড়ির স্টকের সদ্ব্যবহার করে আমরা প্রয়োজনীয় উপহারের কাজ সেরে নিই। যত্নশীলতার কারণে অনেকেই আট দশ বছরের পুরনো শাড়িকে নতুন বলেই গণ্য করে।

শাড়ির ব্যাপারে আমার একটি নিজস্ব অভিমত আছে। তা হলো, বঙ্গ ললনাকে শাড়ি পরিহিতা অবস্থায় যতো আকর্ষণীয়, রূপসী, মায়াবী এবং ...লাগে, অন্য কোনো পোশাকে তার বিশ শতাংশও লাগে না।

একটা কথা বলতে ভুলে গিয়েছি, গিন্নির শাড়ির পছন্দ অনেক বাঘা বাঘা ব্যক্তিত্বের পছন্দের সঙ্গে টেক্কা দেয়। তাই যেমন তাকে সব সময় শাড়িতে না পাওয়ার একটা আলাদা বেদনা মনে পুষে চলি তেমনি অনেক সচিব, এমডি পর্যায়ের কেউকেটাদের গিন্নিরা তাদের শাড়ির কেনাকাটায় আমার গিন্নির সাহায্য নেন বলে মনে মনে একটু গর্ববোধও করি বৈকি।

আপনারা হয়তো ভাবছেন, যে মহিলার শাড়ির ব্যাপারে এতো উচু-দরের রুচিজ্ঞান তার আবার শাড়ি ব্যবহারে এতো কৃপণতা কেন? এ ব্যাপারে তার পক্ষ হয়ে আপনাদের কয়েকটি ক্লু দিতে পারি শুনে তার পক্ষাবলম্বন না করার নিশ্চয়তা যদি দেন। যেমন *এক.* সকাল থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত ঘরকন্নার কাজ একা তাকেই সামলাতে হয়। তাই তার যুক্তি হলো, শাড়ি পরে থাকলে কাজ ধীরগতিতে এগোয়। *দুই.* গরম তার একেবারেই অসহ্য। শাড়ি তো বারো হাত লম্বা, আছে ছায়া-ব্লাউজের বাড়তি ঝামেলা। *তিন.* শাড়ির মেইন্টেনেন্স খরচ সালোয়ার কামিজের চেয়ে কয়েকগুণ বেশি। সবচেয়ে বড় যুক্তি হলো, *চার.* শাড়িতে দেখলে আমি নাকি ওয়াইল্ড হয়ে পড়ি এবং তাকে এতো বেশি আদর... যে তার শাড়ির ভাজ ভেঙে পড়ে, শরীরের ওপরও বেশ ধকল যায়।

এরপরও কি শাড়ি পরা নিয়ে তার সঙ্গে আমার বিবাদ করা সাজে?

আবু ধাবি থেকে
shaju003@emirates.net.ae

বিশটি গোলাপ

- মোহাম্মদ কামরুল হাসান

আজ হরতাল। ঘুম থেকে তাড়াতাড়ি উঠলাম। পিন্টু এবং মামুনের সঙ্গে গতরাতে ফোনে কথা হয়েছে। তারা আমার জন্য অপেক্ষা করছে।

নাশতা না করেই ঘর থেকে বের হলাম। পিন্টুর বাসায় এসে পৌছালাম সকাল নয়টায়। তিনজন এক সঙ্গে বেরিয়ে পড়লাম। কিছু গিফট আইটেম কিনতে হবে। হরতালের কারণে মেইন রোডের দোকানগুলো বন্ধ। রাজপথে মিছিল বা পিকেটিং হচ্ছে না। পুলিশের সতর্ক নজর।

পিন্টু আমার চেয়েও বেশি উদ্বিগ্ন।

মামুন বললো, আপনি যেভাবে বলবেন সেভাবেই করবো।

বললাম, তোমার দায়িত্ব শুধু প্যাকেটটি পৌছে দেয়া।

রিনিকে আগে থেকেই চিনতাম। কিন্তু যোগাযোগের সূত্রটা অন্য কারো মাধ্যমে। আমাদের সম্পর্কটা অদ্ভুত। কখনো দেখা হয়নি, সরাসরি কথা হয়নি। অথচ সম্পর্ক আছে। সে আমার প্রতিটা জন্মদিনে শুভেচ্ছা জানিয়েছে। কিন্তু আমি তার কোনো জন্মদিনে শুভেচ্ছা জানাতে পারিনি। কারণ রিনির জন্ম তারিখ কবে তা জানতাম না। সে একা আমার বার্থডে-তে উইশ করেছে। আমি কিছুই করতে পারিনি। ব্যাপারটায় অস্বস্তি বোধ করতাম।

অনেকবার জানার চেষ্টা করেছি। কিন্তু ব্যর্থ হয়েছি। অবশেষে দেবী রূপে সাহায্যের হাত বাড়ালো মুনা। রিনির বান্ধবী মুনার মাধ্যমে জানতে পারলাম তার জন্মদিন। আমি যতো বেশি আনন্দিত হলাম তার চেয়ে বেশি টেনশনে পড়লাম। কারণ হরতালের মধ্যে কখন গিফট কিনবো, কিভাবে পাঠাবো?

মুনাকে ফোন করে জানলাম রিনির পছন্দের রঙ নীল।

মেয়েরা কি পছন্দ করে তা মেয়েরাই ভালো জানে। তাই এ ব্যাপারে সাহায্যের আশায় শিপ্রাকে ফোন করলাম। বললাম, এখনই আসতে হবে। দশ মিনিটের জন্য খুব দরকার।

শিপ্রা আমাকে ধমক দিয়ে বললো, এই মুহূর্তে তোমার মাথার তিনটা চুল ছিড়ে ফেলা উচিত।

অবাক হয়ে বললাম, কেন?
শিপ্রা বললো, তুমি কি জানো না, আজ হরতাল! বাড়ি থেকে বের হবো কিভাবে?

হতাশ না হয়ে একটি রিকশা নিয়ে বেরিয়ে পড়লাম। হলমার্কস, আর্চিস বন্ধ। পুরো শহর খুজে একটি গৃটিংস কার্ড পেলাম না। উপায়ান্তর না দেখে তড়িঘড়ি করে কিছু গিফট কিনে প্যাকেট করলাম। মামুনকে প্যাকেটটি পৌছে দেয়ার দায়িত্ব দিলাম। তখন গুড়ি গুড়ি বৃষ্টি পড়ছে।

মামুন চলে যাওয়ার পর পিন্টু আমাকে বললো, হরতালের মধ্যে গিফট কেনার জন্য যে কষ্টটুকু করেছিস তা হচ্ছে ভালোবাসার বহিঃপ্রকাশ।

বললাম, তা জানি না। যদি সামর্থ থাকতো তাহলে পুরো পৃথিবীটা একটি প্যাকেটে ভরে রিনিকে গিফট করতাম।

হাতের একমাত্র গোলাপটি পিন্টুকে দিয়ে বললাম, আমার সঙ্গে সঙ্গে তুই কষ্ট কম করিসনি।

হঠাৎ আমার মোবাইলে রিং বেজে উঠলো। রিসিভড করে মামুনের কণ্ঠ শুনতে পেলাম।
হ্যালো ভাই! আমাকে পুলিশ আটকে রেখেছে। বলছে, প্যাকেটের ভেতরে বোম আছে।

পিন্টুকে সঙ্গে নিয়ে দ্রুত ছুটে গেলাম প্যাকেট এবং মামুনকে উদ্ধারের উদ্দেশ্যে।

পুলিশ অফিসারটির বয়স পঞ্চাশের কাছাকাছি। আমার জন্য অপেক্ষা করেনি। তার আগেই প্যাকেট খোলার জন্য সমস্ত আয়োজন সম্পন্ন করেছে।

বাধা দেয়ার চেষ্টা করলাম। বললাম, এতে জন্মদিনের কিছু গিফট আছে।

সাব-ইন্সপেক্টর কঠিন দৃষ্টিতে আমার দিকে তাকালেন। বললেন, হরতালের মধ্যে কিসের জন্মদিন!

ধীরে ধীরে প্যাকেটটি খোলা হলো। প্যাকেটের ভেতরে কয়েকটি গিফট আইটেম এবং কিছু লাল গোলাপ পাওয়া গেল। এসআই খুব হতাশ হলেন। তার আশাভঙ্গ হয়েছে।

বললাম, গুণে দেখেন, বিশটি গোলাপ।

তিনি বিরক্ত হয়ে প্রশ্ন করলেন, বিশটি কেন?

বললাম, আজ তার বিশতম জন্মদিন, তাই।

এসআই হঠাৎ আনমনা হলেন। এক দৃষ্টিতে তাকিয়ে কি যেন ভাবলেন। হয়তো যৌবনের কোনো স্মৃতি রোমন্থন করছেন। দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে বললেন, যান ভাই, দেরি হয়ে যাচ্ছে, ফুলগুলো শুকিয়ে যাবে।

আমরা দেরি না করে প্রস্থান করলাম।

আসার সময় তিনি বললেন, সবার হাতে যদি এভাবে ফুল থাকতো তাহলে এই দেশে শান্তি ফিরে আসতো।

মনে মনে বললাম, তখন হয়তো পুলিশদের উপঢৌকন হিসেবে ফুল দেয়া যেতো।
পিন্টুর হাতের গোলাপটি তাকে দিয়ে বললাম, আপনার জন্য।

আরামবাগ, ঢাকা থেকে

খুনি

- আলভী ইবনে শিহাব

কমপিউটারের মুহুর্মুহু ডাকে ঘুম ভেঙে গেল শম্পার।
শম্পাআপু, ও শম্পাআপু, তাড়াতাড়ি ঘুম থেকে উঠুন। আপনি এক মিনিট বেশি ঘুমিয়ে ফেলেছেন।

চোখ না খুলেই ডান হাতটা উপরের দিকে তুলে অনেকটা বাউ করার মতো করে সিসি (সেন্ট্রাল কমপিউটার)–কে জানালো, সে জেগেছে। পাশ ফিরে শুতে গিয়েই মনে পড়লো আজ ঈদের দিন। সিসি–কে বলে দিয়েছিল সকাল সাতটায় ডেকে তোলার জন্য।

এক লাফে উঠে বসলো। খাটের ওপর বসেই সেন্ট্রাল কমডিউটারকে নির্দেশ দিল বাথরুমে বেলি ফুলের গন্ধ ছড়াতে, শাওয়ারে পানির টেম্পারেচার আঠারো ডিগ্রিতে সেট করতে, বন্ধুরা যারা উইশ করেছে তাদের ছবিসহ পৃন্ট আউট দিতে, প্রত্যেককে একটি করে ফুলের তোড়া পাঠাতে, টেবিলে নাশতা দিতে এবং নাশতার সময় যেন কোনো রোবট আশেপাশে না থাকে সে ব্যবস্থা করতে।

হুবহু মানুষের মতো দেখতে কোনো যন্ত্রের সামনে খেতে তার ভালো লাগে না। সবগুলো কাজ সারতে হবে পাচ মিনিটের মধ্যে।

বিনয়ের অবতার হয়ে সেন্ট্রাল কমপিউটার উত্তর দিল, ফুলের তোড়ার কাজটি ছাড়া বাকি কাজগুলো নির্দিষ্ট সময়ের আগেই হয়ে যাবে।

নাশতার মেনুটা বলে দিয়ে বাথরুমে ঢুকলো শম্পা। চমৎকার বেলি ফুলের গন্ধ। মনটা আরো ফ্রেশ হয়ে গেল। গোসল সেরে টেবিলে খেতে বসলো। আশপাশে কোনো রোবট নেই। তবুও মনটা উসখুস করতে লাগলো।

সেন্ট্রাল কমপিউটার পুরো বাড়ি নিয়ন্ত্রণ করে। বাড়ির প্রতিটা ইঞ্চি সে দেখতে পায়। সে নিশ্চয় এখন খাবার টেবিলে তাকিয়ে আছে। প্রতিদিনই খাবারের সময় কথাটা মনে হয় আর নিজের কাছে অস্বস্তি লাগে। করবে না করবে না, করেও প্রশ্নটি করে ফেললো।

সিসি শুনতে পাচ্ছো?

জি বলুন।

তুমি কি আমার খাবারের দিকে তাকিয়ে আছো?

আমি এ বাড়ির প্রতিটি জিনিস দেখতে পাই।

আমার কথার সোজা উত্তর দাও?

হ্যা, তাকিয়ে আছি।

এরপর থেকে তুমি আমার খাবারের সময় তাকাবে না।

সেটা সম্ভব নয়। তবে আপনি ইচ্ছা করলে ডাইনিংরুম থেকে আমার সেন্সর ডিভাইসটি অফ করে দিতে পারবেন। তবে তা আপনি নিজে পারবেন না। সিসিইউ–তে ঢোকার অনুমতি আপনার নেই। আপনি অনুমতি দিলে স্যারের সঙ্গে আমি কথা বলবো।

থাক, প্রয়োজন নেই। তুমি কি ফুলের তোড়া পাঠাতে পেরেছো?

ওয়েবসাইট জ্যামের কারণে কিছুটা সময় লাগবে।

বাবার এক বছরের ওয়ার্ক শেডিউলের একটা পৃন্ট আমার টেবিলে পাঠাও।

সেটা সম্ভব নয়।

এর আগে তো দিয়েছিলে।

এখন নিষেধ আছে।

কেন, আমি সব অন্যায়–অবিচারের খবর জেনে যাবো বলে?

আগের পৃন্টটা আপনি প্রেসে পাঠাতে চেয়েছিলেন। তারপর থেকে নিষেধ।

এবার পাঠাবো না।

আমার পক্ষে সম্ভব নয়।

বাবাকে বলে দিও, বোমা মেরে, মানুষ মেরে রাজনীতির দিন শেষ হয়ে আসছে।
আপনার সঙ্গে রাজনীতি বিষয়ে আলাপ করা আমার জন্য নিষেধ।
বাবাকে বলে দিও, আমি তার সকল অপকর্মকে ঘৃণা করি।
সিসি নিশ্চুপ।
পেয়ার কিয়া সিনেমার নায়িকার হেয়ার স্টাইল লোড করে একটি বিউটিশিয়ান রোবট আমার ড্রেসিংরুমে পাঠাও। এবং সেই সঙ্গে লন্ডন থেকে আনা সিল্কের শাদা জামাটির ছবি ওয়েবসাইট থেকে সংগ্রহ করে দেশের নামি–দামি মডেলদের গায়ে পরিয়ে প্রিন্ট পাঠাও।
ঠিক সাত মিনিট চেষ্টার পর বিউটিশিয়ান রোবটটার মাথার স্ক্রু খুলে সবচেয়ে ভয়াবহ কাজটা করলো শম্পা। মেমোরি ডিভাইসটা খুলে অনেক সংগোপনে লুকিয়ে রাখা নতুন একটা ডিভাইস লাগিয়ে দিল। মুহূর্তেই বিউটিশিয়ান থেকে খুনিতে রূপান্তরিত হয়ে গেল রোবটটি। নির্দিষ্ট কোড ব্যবহার করে এখন শুধু শম্পাই একে দিয়ে যা খুশি করতে পারবে। ঘাড়ের পেছনে আঙুল দিয়ে সুইচ অন করামাত্রই শোয়া থেকে এক লাফে উঠে দাড়ালো। প্রথমে খানিকটা উদভ্রান্তের মতো মনে হলো। রিমোট দিয়ে কোড ব্যবহার করে মেমোরি সেলে প্রয়োজনীয় নির্দেশ দিয়ে নিজের রুমের দরজা খুলে দিল। টলতে টলতে বেরিয়ে গেল বিউটিশিয়ান রোবটটি। দুই তিনবার ডানে–বামে মাথাটা মৃদু ঝাকি দিল।
সিসিকে মোলায়েম কণ্ঠে ডাক দিল শম্পা। বললো, আট মিনিট পার হয়েছে, তুমি সেন্সর ডিভাইস চালু করতে পারো। বহু অনুনয়–বিনয় করে এক বছর আগে সিসির কাছ থেকে কথা আদায় করেছিল আগামী ঈদের দিন দশ মিনিটের জন্য সে একা থাকবে অর্থাৎ সেন্সর ডিভাইসটি অফ থাকবে। কোনো কারণ নেই, এমনি।
সিসি তার কথা রক্ষা করেছে সমস্ত নিয়ম ভঙ্গ করে। আর এ সুযোগটি অপেক্ষায় ছিল শম্পা।
ঠিক আধঘণ্টা পর বাড়িতে সাইরেন বেজে উঠলো। ইলেকট্রিক শর্ট সার্কিট, পোড়া গন্ধ বাতাসে। মুহূর্তেই বাড়িতে দৌড়–ঝাপ শুরু হলো, সঙ্গে চিৎকার–চেচামেচি। কিন্তু আশ্চর্যজনকভাবে সিসি চুপচাপ।
পরদিন খবরের পাতায় মাস্টহেড বের হলো রোবট বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের মন্ত্রীর বাড়িতে ভয়াবহ দুর্ঘটনা। দেশের সবচেয়ে দামি কমপিউটারটি আর নেই।
সাবহেডে লেখা হলো খুনি একজন রোবট।

চাষাড়া, নারায়ণগঞ্জ থেকে

উজবুক

- সোহেল

যদিও কোনোকালে কোনো খেলাতে পারদর্শী ছিলাম না তবুও প্রতিদিন রুটিন করে বিকেলবেলা মোরশেদের বাসার সামনে হাজির হতাম। এই হাজিরাটা মোটেও ব্যাডমিন্টন খেলার লোভে নয়। হাজির হতাম কারণ মোরশেদের বোন বীথি।
চার তলার বারান্দার রেলিং ধরে সে দাড়িয়ে থাকতো। আমি এবং আমার মতো আরো দুই একজন তখন ব্যাডমিন্টন কোর্টের দিকে নয়, বরং চার তলার বারান্দার তাকিয়ে থাকতো। কিন্তু বীথির মনোযোগ খেলা বা আমাদের দিকে নয়, আকাশ ছিল তার অতি প্রিয়। যদিও কখনো মাটির দিকে তাকাতো, তখন আমাদের শকুনি চোখ দেখে সুবর্ণার মতো কটাক্ষ হেনে আবার আকাশেই দৃষ্টি স্থির করতো। তাতেই আমাদের বুকে একটা লম্বা শ্বাস আরো লম্বা হতো।
একদিন খেলা বন্ধ। আমরা সবাই কোর্টের পাশে বসে আড্ডা দিচ্ছি। এর মধ্যে হঠাৎ দেখি চার তলার সেই সুবর্ণা চোখের অধিকারিণী তিন চারজন সখী পরিবেষ্টিত হয়ে নিচে নেমে এসেছে।

আমরা সবাই কথা বন্ধ রেখে ধন্য হয়ে যাওয়া মাটিকে দেখতে লাগলাম।

এক সখী মাটি কাপিয়ে আমাদের দিকে এগিয়ে এলো।

আমরা দম বন্ধ করে বসে রইলাম।

কাছে এসেই খুব তাচ্ছিল্যের স্বরে বললো, সোহেলভাই, একটু এদিকে আসবেন?

অন্যদের দিকে গর্বভরে তাকিয়ে বন্ধ করা দম ছাড়লাম। বাজি ধরে বলতে পারি, অন্যরা তখন আমার প্রতি ঈর্ষায় দম ছাড়তে ভুলে গেছে। কাছে গিয়ে জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইলাম। আমার বোকা বোকা চেহারা দেখে ফিক করে হেসে ফেললো।

এক সখী বললো, আপনি প্রতিদিন ইতির দিকে তাকিয়ে থাকেন কেন?

চেহারাটাকে যতোটুকু বোকা বানানো সম্ভব তার চেয়ে বেশি বোকা বানিয়ে তাকিয়ে রইলাম।

সখীরা আবার হিঃ হিঃ শুরু করলো।

একজন খুব রাগী ভঙ্গিতে বললো, এতো কথায় কাজ কি? আসল কথা জিজ্ঞাসা কর।

অন্যজন বাংলা সিনেমার এক্সট্রাদের মতো বেহায়ার হাসি দিয়ে জিজ্ঞাসা করলো, আপনি বীথির সঙ্গে প্রেম করতে চান?

আমার বুকে তখন চার হাজার ওয়াটের ড্রাম বাজছে। চোখে-মুখে সমস্ত আগ্রহ নিয়ে নায়িকার দিকে তাকালাম।

সে তখনো আকাশ দেখায় ব্যস্ত।

অবাক আর অবিশ্বাস নিয়ে তার দিকে চেয়ে রইলাম। কোনো কথা মুখ দিয়ে বের হলো না।

কিছুক্ষণ পর সমস্ত জগতের বিরক্তি নিয়ে সে আমার দিকে তাকালো। এবং বললো, উজবুক কোথাকার! বলেই সখীদের হাসির লহরের মধ্য দিয়ে চার তলার সিড়ির দিকে এড়িয়ে গেল।

এরপর হঠাৎ করেই এ উজবুকটা ভীষণ স্মার্ট হয়ে গেল। ইন করে শার্ট পরে, গায়ে ভুরভুর করে পারফিউম মেখে স্কুল ফাকি দিয়ে দুপুরের কড়া রোদে জ্যোৎস্নার সুখ নিতে লাগলাম। বীথি আর আমি বাজি ধরে বোটানিকাল গার্ডেনের সব কয়টা গাছে নাম মুখস্থ করে ফেললাম। মোরশেদদের বাসার দরজাও আমার জন্য অবারিত হলো।

বীথি দিন দিন আরো সাহসী হয়ে উঠলো।

আমরাও প্রকৃতি ছেড়ে মানুষের মাঝে ফিরে এলাম।

বন্ধুদের ফাকা বাসার বন্ধ দরজার ভেতর বীথি তার রহস্য একটু করে উন্মোচন করতে লাগলো।

বীথির উদারতায় ওই বয়সেই মেয়েদের শরীরের সব কিছু জেনে গিয়েছিলাম। তখন আমার দিনগুলো ছিল স্বপ্নময় আর রাতগুলো ছিল নিদ্রাহীন। সেসব দিন ছিল অন্য রকম। আহা, কি সুন্দর ছিল সেই সব দিন!

তারপর অনেক বছর কেটে গেছে। এখন আমার পেট প্যান্টের বেল্টের বাইরেও অনেকটা প্রসারিত। মাথার ত্বক আর চুলের আড়ালে থাকতে চায় না। এখন মেয়েরা আমাতে আর আলাদা রহস্য তৈরি করে না। এখন আমি মেয়েদেরকে মেয়ে বলেই জানি।

এ রকমই একদিন অফিস ফেরতা আমি নারী কণ্ঠের আহ্বান শুনতে পেলাম। আমার নাম ধরেই কেউ ডাকছে। হুম, বেশ ঝলমলে একটা মেয়ে।

কাছে যেতেই ঝনঝনিয়ে উঠলো, চিনতে পারছেন না? এম্মা! আপনার মাথা তো ডেমরা স্টেডিয়াম হয়ে যাচ্ছে।

ধাধায় পড়ে গেলাম। চেনা চেনা লাগছে বটে।

মধুকণ্ঠী এবার তার সঙ্গের ভদ্রলোককে প্রয়োজনের অতিরিক্ত জড়িয়ে ধরে পরিচয় করাতে লাগলো, আমার হাজব্যান্ড আর এ হলো সোহেলভাই। ওই যে মোরশেদ ভাইয়ের বন্ধু। বীথি ছলকে ছলকে হাসতে লাগলো। জানো, এ সোহেলভাই যা বোকা ছিল। সেই সময় তো আমার প্রেমে একেবারে ডুবে গিয়েছিল। কিন্তু আমি তখন খুব শক্ত টাইপের ছিলাম তো, তাই পাত্তা দিইনি।

অবাক হয়ে বীথির দিকে তাকিয়ে রইলাম। তার বাকপটুতার আবারও মুগ্ধ হলাম।

সে এবার একটু দয়ালু হলো। আমার কাধে হাত রাখলো। জানেন সোহেলভাই, এখন আমার নিজের ওপর রাগ হয়। ইশ, করতামই না হয় তখন একটু প্রেম! কি আর তেমন ক্ষতি হতো?

বীথি বরাবরই একটু দয়ালু ছিল। কৃতজ্ঞতা ভরে তার স্পর্শটুকু অনুভব করতে লাগলাম। আমাকে এবং চারপাশের বাতাসকে মুগ্ধ করে স্বামীর সঙ্গে বীথি লেপটে থেকে চলে গেল। এবং আমি চিরকালের উজবুক তার শেষ উদারতাটুকু নিয়ে মুগ্ধ হয়ে ঠাই দাড়িয়ে রইলাম।

গৃন রোড, ঢাকা থেকে

বৌ ছাড়া

- সাহাব উদ্দিন আহম্মেদ

আটাশ বছর বয়সের জীবনে বেশ কিছু ঈদ কাটিয়েছি। ঈদ কাটিয়েছি পরিবারের সঙ্গে, বন্ধু বান্ধবীদের সঙ্গে। অনেক মজাও করেছি।

২০০১ সালের ৮ জুলাই বিয়ে করি। বর্ষ পরিক্রমায় আবারও ঈদ আসে। ঈদ যতোই এগিয়ে আসে ততোই বিভিন্ন স্বপ্ন, কল্পনা দানা বাধতে থাকে। ভাবি এবার নতুন বৌকে নিয়ে ঈদ করবো। উৎসাহ-উদ্দীপনা থাকবে আলাদা। অনেক মজাও হবে।

যথাসময়ে ঈদের সব শপিং সম্পন্ন করলাম। যখন দেখবো ভাই-বোন, মা-বাবা, শ্যালক-শ্যালিকা এবং বৌ যখন আমার দেয়া কাপড় পরবে তখন আনন্দে আমার বুকটা ভরে যাবে। নতুন কাপড় পরে অনেকে বলবে বেশ ভালো হয়েছে। অনেকে বলবে খুশি হয়েছি আবার অনেকে এসে সালামও করবে। বৌ এসে বলবে, দেখো সাবু, আমার শাড়ির কুচিগুলো ঠিক আছে কি না। নিজেও প্রথম ঈদে শ্বশুরবাড়ির দেয়া পোশাক পরবো। তারপর আত্মীয়স্বজন বা বন্ধুদের বাসায় বেড়াতে যাবো। সেখানেও অনেক মজা হবে। আরো ভাবতে থাকি যে, ঈদের রাতটিও হবে অনেক আনন্দপূর্ণ। কারণ এ রাতে দুজনের মনেই থাকবে আনন্দ।

থাকবে বাড়তি ভালোবাসা, আবেগ, বাড়তি আবেশ, অনুভূতি। এই রাতটি এমন একটি রাত হবে যেন দীর্ঘ দিন আমাদের মনে থাকে। যেমন মনে আছে বাসর রাতের কথা। প্রতিজ্ঞা করবো দুজন, আমাদের প্রতিটি রাতই যেন হয় আনন্দ, উৎসবে পরিপূর্ণ এবং ঈদের মতো পবিত্র। এভাবে কল্পনার জাল বুনতে থাকি। কিন্তু হায়, সব কল্পনা, সব স্বপ্ন ধুলিসাৎ করে দিয়ে ব্যবসায়িক কাজে অর্থাৎ চামড়া কেনার জন্য ঈদের চার পাচ দিন আগে আমাকে চলে যেতে হলো গোপালগঞ্জ।

ঈদের দিন সকালে গোসল করে এসে ঈদগাহে যাওয়ার জন্য পোশাক পরেছি। কিন্তু কেউ আমাকে সেমাই খেতে বলে না। মা, বন্ধু-বান্ধব, সহধর্মিণী বৌটিও নেই। স্বপ্ন স্বপ্নই থেকে গেল। জানি না, মা আমার জন্য কতো না ছটফট করেছেন। ছটফট করছে বৌটিও। সবার কথা মনে পড়তে থাকলো। মনে হতে থাকলো, এই পবিত্র ঈদে আমার যেন কেউ নেই। আমি একা। মা-বাবা ভাই-বোন ছাড়া, পরিবার ছাড়া, এলাকা ছাড়া ঈদ করা যে কতো কষ্ট, বেদনার, হতাশার এই প্রথম টের পেলাম। নিজের অজান্তে কতোক্ষণ চোখের পানি ঝরালাম। তারপর চামড়া কেনার মধ্য দিয়েই সেই বছরের ঈদ কাটালাম। বাড়তি আকর্ষণ আর বাড়তি স্বাদ পাওয়া থেকে বঞ্চিত হলাম।

২০০২ সালের ঈদের পয়তাল্লিশ দিন আগে ইটালির উদ্দেশ্যে যাত্রা শুরু করি। এবারের ঈদ কাটে আরো করুণভাবে। আর খারাপ অবস্থায় কারণ এই বছরের ঈদ কাটে আফ্রিকার দেশ মৌরিটানিয়ায় একটি রুমে বন্দী অবস্থায়। বিয়ের পর দ্বিতীয় বছরের ঈদও কাটে বৌকে ছাড়া, স্বপ্ন, আবেগ, আবেশ, অনুভূতি ও স্বাদ ছাড়া। ২০০৩ সালের ঈদ কাটে ইটালিতে। বাড়তি কিছু তো দূরের কথা, সব কিছু ছাড়া। ২০০৪ সালের ঈদও কাটবে ইটালিতে।

জীবনে বহু ঈদ পরিবারের সঙ্গে কাটালেও বিয়ে করে একটি ঈদও বৌকে নিয়ে এক সঙ্গে কাটাতে পারলাম না। আমার স্বপ্নগুলো স্বপ্নই থেকে গেল। বাড়তি আকর্ষণ, সাধ–আহ্লাদের সুযোগ আর হলো না।

জানি না জীবনে কবে বৌকে নিয়ে প্রথম ঈদ কাটাবো, স্বপ্ন সত্যি হবে, বাড়তি আকর্ষণের আহ্লাদ ও ভালোবাসার সাধ ভোগ করবো।

রোম, ইটালি থেকে

বেদনার রঙ নীল

আমার ভালোবাসা,

প্রথমে তোমাকে জানাই আমার অন্তরের অন্তরস্থল থেকে ভালোবাসা, ঈদের শুভেচ্ছা। কেমন আছো? আমাকে ছাড়া খুব বেশি ভালো আছো! খুব জানতে ইচ্ছে করে।

প্রায় পাচ বছর হতে চললো আমাকে ফেলে চলে গেছো। নিজের মধ্যে যখন খুব কষ্ট হয় তখন তোমাকে লিখি আর নষ্ট করে ফেলি। কারণ সেই কষ্টের লেখাগুলো পৌছানোর কোনো উপায় নেই। তাছাড়া কোনো অধিকারও নেই। তাহতো মনের কিছু কথা তোমার কাছে পৌছানোর জন্য এই মাধ্যমটা বেছে নিলাম।

সোনা, আমি ভাগ্যকে খুব বিশ্বাস করি। কোনোদিন তোমার সামনে যাওয়ার ভাগ্য হবে কি না জানি না। কিন্তু তোমাকে এতোটাই ভালোবাসি যে, তোমার সব কিছু শোনার পরও সেই ভালোবাসা এক ফোটা কমেনি। সবার ভালোবাসার মধ্যে স্বপ্ন থাকে আমার ভালোবাসার মধ্যে আজ আর কোনো স্বপ্ন নেই সব কিছু তুমি শেষ করে দিয়েছো। তবে আজও হৃদয়ের সমস্ত জায়গা জুড়ে আছো তুমি। তবে আজ আমার ভালোবাসায় কষ্টের পরিমাণ বেশি। তুমি যে এতো বলো, একবার দেখা করো। কিসের জোরে আজ তোমার সামনে যাবো বলতে পারো?

আমার মনে যে কোনো শক্তি নেই। মনকে যে বোঝাতেই পারি না তুমি আমাকে ভালোবাসো। আমাকে কষ্টের সাগরে ফেলে দিয়ে তুমি জাপান চলে গেলে। কতো কষ্ট করে ওই দিনগুলো পার করেছি, তুমি জানো? জানো না। কখনো জানার চেষ্টাও করোনি। যে মেয়েটা তুমি একদিন বাড়ি না থাকলে অস্থির থাকতো, একবেলা ফোন না করলে তার চোখ দিয়ে পানি ঝরতো, প্রতিটি সময় তোমাকে নিয়ে টেনশন করতো, তোমার কারণে তার ঠিক মতো খাওয়া, ঘুম হতো না তাকে কিভাবে পারলে এতো কষ্ট দিতে? এভাবে তার সঙ্গে প্রতারণা করলে? সত্যি যদি আমাকে ভালো না বাসতে তাহলে বলতে পারতে তুমি অন্য কাউকে ভালোবাসো, এতো সূক্ষ্ম অভিনয় করার দরকার ছিল না। এতো বেশি মিথ্যা বলে সম্পর্ক চালানোর দরকার ছিল না।

কোনো একটা চিঠিতে লিখেছিলে, ভালোবাসার রঙ নাকি *সবুজ* আর বেদনার রঙ নাকি *নীল*। তুমি লিখেছিলে আর সবার মতো আমাদের শেষ রঙ কি হয়? সারা জীবনের জন্য নীল রঙটা আমার হৃদয়ে একে দিলে। প্রতিটি চিঠিতে লিখতে, আমাকে ক্ষমা করো। ছোট ছোট ভুলের ক্ষমা করতে তুমি যে এতো বড় ভুল করবে বুঝতে পারিনি। আমি যে, এতো লিখতাম আমার কষ্টটা বোঝে, উত্তরে তুমি লিখতে, আসলে তোমার কষ্টটা কি? এখন বোঝো কেন এতো কষ্ট করতাম। বুঝতাম আমার প্রতি তোমার ভালোবাসা কম ছিল। তাই বলে এতো কম বুঝিনি।

ব্যস্ত জীবনের মাঝ থেকে এক মুহূর্তে অবসর খুজে নিয়ে তুমি আমাকে নয়, আমার ভালোবাসাকে বিশ্লেষণ করার চেষ্টা করো দেখবে আমার ভালোবাসা জয়ী হবে। মাঝে মধ্যে মনে হয় আমার আবেগ, ভালোবাসা, ব্যাকুলতা, মিষ্টি চিঠি তোমাকে একটুও আচ্ছন্ন করিনি? একটুও মনে হয়নি এই শিশুর মতো সরল মেয়েটাকে কষ্ট দিলে তুমি কোনোদিন সুখী হবে না, তার কষ্টের নিঃশ্বাস প্রশ্বাসে তুমি প্রতিটি সময় জ্বলবে! আমার জীবনে সর্বশ্রেষ্ঠ স্বপ্নটা তুমি পূরণ করতে দিলে না। তুমি জানো। পৃথিবীতে সবচেয়ে কঠিন কাজ কাউকে ভালোবাসা এবং সেই ভালোবাসা নিয়ে আমার সঙ্গে তুমি নোংরাভাবে খেললে?

অনেক অভিযোগ করলাম। তারপরও সবচেয়ে সত্যি কথা কি জানো, হাজার কষ্ট পেলেও আমার জীবনে প্রকৃত সুখের স্মৃতিগুলো তোমাকে নিয়ে, এ সময় কষ্ট পেলেও যতোটা সুখ আমি পেয়েছি, এই জীবনে আর হয়তো কোনোদিনই পাবো – প্রথম স্পর্শ, ভালোবাসা, অনুভূতি, প্রেম, আকুতি, কামনা, চাওয়া, বিরহ, পাওয়া, আহা তুলনাহীনা!

জীবনে সবই প্রথম এ কারণে, এখনো মন চায় তোমাকে দেখতে, তোমার সঙ্গে কথা বলতে। যাকে ছাড়া আমি কখনো একটা মুহূর্ত নিজেকে নিয়ে ভাবিনি, আজ এতোটা দিন তাকে কাছে পেয়েও পারি না। তাকে নিজের করে ভাবতে, মন খুলে দুটো কথা বলতে, এ যে কতো কষ্টের সেটা কিভাবে বোঝাই!

এখনো মন চাইলে আমার সঙ্গে কথা হচ্ছে, দেখা হচ্ছে। যখন অন্য কারো সংসারে চলে যাবো তখন বুঝবে জীবনে একটা সত্যিকারের ভালোবাসার কতো দাম। তোমার জীবনে ফিরে যাওয়ার যদি একটা পথ খোলা রাখতে তাহলে চাদবৌ কখনো অন্য কারো বৌ হতো না। মধু, মাঝে মধ্যে আকাশের বড় চাদটার দিকে তাকিয়ে বলো, আই লাভ ইউ চাদবৌ।

ভালো থেকো।

তোমার **চাদবৌ**

নামবিহীন, যশোর থেকে

বিয়ের শাড়ি

– আতিয়া সুলতানা

কনের জন্য বরপক্ষের পাঠানো বিয়ের সুটকেসটা ভেতরে চলে এসেছে। বেশ বড়সড়ো সুটকেস। তার ওপর বেশ ভারীও।

কনে সীমার বান্ধবীরা ব্যস্ত হয়ে উঠেছে সুটকেসটা খোলার জন্য। কার আগে কে খুলবে এই নিয়ে একটা কাড়াকাড়ি ভাব। শেষ পর্যন্ত এই মহা দায়িত্বটা কিভাবে যেন নিজের আয়ত্বে নিয়ে নিলেন সীমার বাবা মফিজের কলিগ মেহফুজের স্ত্রী লায়লাবানু। বয়সের বিস্তর পার্থক্য থাকা সত্ত্বেও সীমার সঙ্গে লায়লাবানুর সম্পর্ক বন্ধুসুলভ ও আন্তরিক।

লায়লাবানুর দুই ছেলেমেয়ে। ছেলে সবেমাত্র কলেজে পা দিয়েছে। মেয়ে টুকটুকি এখনো স্কুলের গণ্ডি পার হয়নি। বাড়তি ঝামেলা না থাকায় অবস্থা বেশ সচ্ছল। কিন্তু একই পদে চাকরি করা সত্ত্বেও পরিবারের সদস্য সংখ্যা বেশির কারণে সীমার বাবার সংসার সচ্ছল নয়।

চার ভাইবোনের ভেতরে সীমাই বড়। ছোট তিন ভাইবোন স্কুল পড়ুয়া। তার ওপর বন্যার কারণে ঘরবাড়ি আর মাঠের ফসল ভেসে যাওয়ার ফলে দাদা-দাদি সর্বস্বান্ত হয়ে একমাত্র ছেলের শহরের বাড়িতে এসে আশ্রয় নিয়েছেন।

এই অবস্থায় সীমার বিয়ের ব্যাপারে এগোতে চাননি মফিজ। কিন্তু সব সময় কি সৎ পাত্র মেলে! তাছাড়া পাত্র সীমাকে পছন্দ করেছে। বিয়েটা এখনো দিতে অস্বীকার করলে পরে যদি মনের মতো পাত্র আর না মেলে!

সীমার মায়ের এসব যুক্তি একেবারে অগ্রাহ্য করতে পারেননি সীমার বাবা মফিজ। ছেলেমেয়েকে সাজিয়ে দিতে হবে। দিতে হবে ছেলের জন্য একটা মোটর সাইকেল। বিয়ের বরযাত্রী হিসেবে পঞ্চাশজনের বেশি আসবে না কথা দিয়েছেন সীমার হবু শ্বশুর রহমত শেখ।

কিন্তু এই খরচটুকু সামাল দিতে হিমশিম খেতে হয়েছে মফিজকে। প্রভিডেন্ট ফান্ড থেকে টাকা উঠিয়ে মোটর সাইকেল কিনেছেন। সীমার মায়ের গহনা যা দুই একটা ছিল তারই সঙ্গে আরো কিছু দিয়ে হালকা একসেট গহনা গড়িয়েছেন। পঞ্চাশজন বরযাত্রীর জন্য খাবার জোগাড়ের পুরো টাকাটাই ধার–দেনার মধ্যে রয়ে গেছে। তাই মেয়ের জন্য দুই একটা শাড়ি কিংবা এটা–সেটা কেনার সামর্থ হয়নি তার। মেয়ের মা বার বার একটা ভালো শাড়ির কথা বললেও জবাব দেননি তিনি।

বরপক্ষের দেয়া কনের জন্য সুটকেস নিশ্চয়ই মেয়ের বিয়ের শাড়ি এবং আনুষঙ্গিক থাকবে ভেবে সান্ত্বনা পেতে চেষ্টা করেছেন মেয়ের মা জাহানআরা বেগম।

বিয়ের সুটকেসটা দেখার পর থেকেই কেমন যেন বুক ধড়ফড় করছে সীমার। সেই ছোটকাল থেকে পুতুল সাজানোর ছলে নিজেকেই বার বার কল্পনা করেছে সে ভবিষ্যৎ কনে রূপে। স্বপ্নে দেখেছে একটি মনের মতো বিয়ের শাড়ির। খুব একটা দামি নয়, মোটামুটি সাধারণ মানের চেয়ে একটু বেশি দামি, একটু আকর্ষণীয় রঙ। সেটা যে লালই হবে এমন নয়, হতে পারে ময়ূরকণ্ঠী, পিংক অথবা ম্যাজেন্টা রঙ–এর। এমনি একটা শাড়ি অবশ্য দেখেছিল সে শাড়ির দোকানে। এই তো মাত্র গত মাসের কথা।

বিএ পরীক্ষা দেয়ার পর অবসরেই ছিল সে। সেই সময় ঈদের আগে রোজার পুরো মাসটা একটা শাড়ির দোকানে সেলসগার্লের কাজ করেছিল। শাড়ি বিক্রি করতে করতে হঠাৎ পেয়ে গিয়েছিল একটি মনের মতো শাড়ি। সেই শাড়িটার প্রতি এমন দুর্বলতা এসে গিয়েছিল যে, কাস্টমার শাড়ি দেখতে চাইলে ওটাকে আড়ালে রেখে অন্য সব শাড়ি দেখাতো। শাড়িটার দাম দিন তিন হাজার টাকা। যেহেতু তার ওই এক মাসের বেতনও ছিল তিন হাজার টাকা, ইচ্ছা করলে অবশ্য ওই বেতনটার বিনিময়ে শাড়িটা নিতে পারতো। কিন্তু নেয়নি। সেটা অবশ্য বাড়ির কথা ভেবেই। তার ওই তিন হাজার টাকা ঈদের খরচে যথেষ্ট সাহায্যে আসবে জানতো সে।

শাড়িটার কথা একদিন বলেছিল সে পাশের ফ্ল্যাটের আন্টি লায়লাবানুকে। আন্টি, আমি যে শাড়ির দোকানে কাজ করছি, খুব সুন্দর একটা শাড়ি আছে ওখানে।

তাই নাকি? কতো দাম?

তিন হাজার।

তুমি বলছো খুব সুন্দর। দাম তো বেশি নয়। তা বিক্রি হয়নি?

বিক্রি তো হতোই। আমি ইচ্ছা করেই ওটা একটু আড়ালে রেখেছি। আমার খুব পছন্দ। আপনি কিনবেন?

বিস্ময়ভরা দৃষ্টিতে লায়লাবানু তাকিয়ে ছিলেন সীমার দিকে। কি ভেবে যেন রাজি হয়ে গিয়েছিলেন। বলেছিলেন, ঠিক আছে, আমাকে সঙ্গে নিয়ে যেও তোমার দোকানে, শাড়িটা দেখবো।

শাড়িটা দেখে ভালো লেগেছিল লায়লাবানুর। কিনে নিয়েছিলেন তিনি।

এই সীমা একটু দেখি, চাবিটা যেন কোথায় পড়লো।

লায়লাআন্টির কথায় স্মৃতির অতলে হারিয়ে যাওয়া সীমা মুহূর্তে বাস্তব ফিরে পায়। একটু এদিক–ওদিক দেখতেই চাবিটা পান তিনি। সুটকেসটা খোলেন তিনি প্রচণ্ড আগ্রহ নিয়ে। সবাই তীব্র আগ্রহ নিয়ে তাকিয়ে আছে সুটকেসের দিকে। বিরাট সাইজের সুটকেসের ভেতর থরে থরে সাজানো হরেক রকম জিনিস। সবার ওপর রয়েছে গহনার বক্স। ধীরে ধীরে যত্ন করে গহনার বক্সটা খোলেন লায়লাবানু। সুন্দর একটা হার আর তার সঙ্গে ম্যাচ করা কানের ঝুমকা রয়েছে। সবাইকে দেখান তিনি। এরপর এক এক করে বের করেন বিভিন্ন

কসমেটিক্স। একে একে অনেক কিছু বের করলেও বিয়ের শাড়িটা বের করছেন না আন্টি! বড্ড বুক ধরপর করছে সীমার। তাই বলে সে তো আর নিজের মুখে বিয়ের শাড়িটা বের করতে বলতে পারছে না। কনে বলে কথা!

শেষ পর্যন্ত শাড়ি বের করা শুরু করেন লায়লাআন্টি। দুটো সাধারণ পরার শাড়ি, দুটো মধ্যম মানের রাজশাহী সিল্ক মিলিয়ে ব্লাউজ পেটিকোট।

কিন্তু একি! বিয়ের শাড়ি কই? থমকে যান লায়লাআন্টি! সীমার বিয়ের শাড়ির প্রতি দুর্বলতার কথা জানা আছে তার। সমস্ত সুটকেস আতিপাতি করেও খুজে পান না। তিনি শংকিত। শাড়িটা!

কথাটা মেয়ে মহলে জানাজানি হতে দেরি হয় না। এক নাম না জানা অশান্ত ঝড় সীমার বুকের ভেতর আলোড়িত হতে থাকে। বহু কষ্টে চোখের পানিকে আটকে রেখে স্থির হয়ে বসে থাকে সে।

সীমার মা তার সুটকেস খুলে বের করে আনেন বহু যত্নে সংরক্ষণ করা নিজের বিয়ের শাড়িটা। কিন্তু হায়! কালের নির্মম আঘাতে শাড়িটা হারিয়েছে তার ঔজ্জ্বল্য। এই শাড়িতে কেমন করে সাজাবেন তিনি তার একবিংশ শতাব্দীর অষ্টাদশী কন্যাকে।

নানানজনের নানান কথা উপক্ষো করে সুটকেসটা সযত্নে বন্ধ করেন লায়লাবানু। সীমার কানে কানে বলেন তিনি, একটু বস, আসছি আমি।

সীমা কিছু বোঝার আগেই মাত্র দশ মিনিটের ব্যবধানে ফিরে আসেন লায়লাবানু। হাতে তার সীমার একান্ত পছন্দের শাড়িটা যা তিনি সীমার ইচ্ছাতেই কিনেছিলেন। লায়লাবানু সীমার কানে কানে বলেন,

এই শাড়িটা তোমার বিয়েতে আমার উপহার।

জ্বালা করে ওঠে সীমার চোখ দুটো। এতোক্ষণের চেপে রাখা কান্নার নোনাজল নেমে আসে গাল বেয়ে।

নর্থ সার্কুলার রোড, ঢাকা থেকে

ইকো পার্কে

- রোজিনা আখতার

মানুষের জীবনে এমন কতোগুলো স্মৃতিময় দিন থাকে যা কখনো ভোলা যায় না। তেমনি আমার জীবনের আনন্দঘন স্মৃতিময় দিনটি হচ্ছে *ইকো পার্ক*–এ শিক্ষা সফর। সেই আনন্দময় দিনের কথা লিখে শেষ করা যাবে না। সেই দিনটি ছিল সবচেয়ে আনন্দদায়ক দিন।

দিনটি ছিল ৪ নভেম্বর ২০০২। শীতের সবেমাত্র শুরু। কলেজের ফাইনাল ইয়ারের প্রায় অর্ধশতাধিক ছাত্রছাত্রী সম্মিলিতভাবে এক শিক্ষা সফরের আয়োজন করেছিলাম। আমরা সকলেই পরীক্ষার্থী বিধায় অধিক সময় নষ্ট না করে কাছাকাছি কোনো স্থানে যাওয়ার পরিকল্পনা করলাম। সকলের মতামত অনুযায়ী আমাদের পিকনিক স্পট নির্ধারিত হলো সীতাকুণ্ডের ইকো পার্ক–এ।

৪ নভেম্বর সোমবার আমাদের যাওয়ার তারিখ নির্ধারিত হলো। ওই দিন সকাল নয়টায় বেরিয়ে পড়ি কলেজের উদ্দেশ্যে। আগে থেকেই আমাদের বাস, মাইক ও অন্যান্য যাবতীয় আসবাবপত্র ঠিক করা ছিল। এবং এখান থেকে আমরা প্যাকেট বিরিয়ানি নিয়ে গিয়েছিলাম। তাই যাত্রার আগে কোনো বেগতিক পরিস্থিতির সম্মুখীন হতে হয়নি।

কলেজ থেকে আমরা রওনা হলাম প্রায় এগারোটায়। কারণ বিভিন্ন জায়গা থেকে সকলের আসতে কিছুটা বিলম্ব হলো। যথাসময়ে আমরা মীরসরাই কলেজ প্রাঙ্গণ থেকে *শিক্ষা সফর ২০০২* ব্যানার খচিত বাসে যাত্রা শুরু করলাম। শীতের মিষ্টি রোদ ও মৃদুমন্দ হাওয়ায় দুলে দুলে চললো আমাদের গাড়ি।

আমরা সঙ্গে করে হারমোনিয়াম, ঢোল, তবলা, গিটার সব নিয়েছিলাম। তাই তো গাড়িতে বসে সবাই গলা ছেড়ে গান গেয়ে আনন্দ করছিলাম। আমাদের সঙ্গে ছিলেন মীরসরাই কলেজের অধ্যক্ষ মোহাম্মদ শরীফসহ মোট চারজন টিচার সস্ত্রীক।

তাছাড়া আমাদের বড় ভাইয়েরাও ছিলেন কয়েকজন। রাস্তা ফাকা থাকার কারণে আমরা অতি অল্প সময়ে আমাদের সেই আকাঙ্ক্ষিত স্থান ইকো পার্ক-এ এসে পৌছালাম। যদিও গাড়ি ভেতরে প্রবেশ করতে দেয়া হচ্ছে না তবুও আমাদের বড়ভাইদের সহযোগিতায় আমরা ভেতরে গেলাম গাড়ি নিয়ে। তখন প্রায় একটা।

আমরা গাড়ি থেকে নেমে নাশতা খেলাম। উচু-নিচু পাহাড়ের মধ্যে হাটতে হাটতে নাশতা খেতে ভালোই লাগছিল। পাহাড়গুলো এতো সুন্দর যা চোখে না দেখলে বিশ্বাস করা যায় না। পাহাড়ের বুকে ছিল বিশাল ঝরনা যা খুব আকর্ষণীয়। অনেকক্ষণ পর্যন্ত উচু-নিচু পাহাড়ের মধ্যে উঠানামা করেছিলাম। তারপর আবার গাড়িতে উঠে আরো ভেতরে গেলাম।

গাড়ি থেকে নামার পর আমাদের সবার উদ্দেশ্যে শ্রদ্ধেয় আফসারস্যার সংক্ষিপ্ত বক্তব্য রাখলেন। তারপর সবাই আলাদা হয়ে গেলাম। কেউ কেউ প্রকৃতির সুন্দর দৃশ্যের এবং নিজেদের ছবি তোলা নিয়ে ব্যস্ত।

আমরাও অনেক ছবি তুললাম। আমরা কয়েকজন গিয়ে বসলাম রেস্ট হাউসে। রেস্ট হাউসে বসে এয়ারফোর্সের অফিস, ঝরনা, পাহাড়ের বড় চূড়া ছাড়াও সুন্দর ফুলের বাগান দেখতে পেলাম। প্রায় এক ঘণ্টা রেস্ট হাউসে বসার পর শুরু হলো খাওয়া পর্ব।

একজন স্যার আমাদের মাঝে প্যাকেট বিরিয়ানি বিলি করলেন। কেউ দাড়িয়ে, কেউ বসে, কেউ হেটে অনেক মজা করে খাওয়া পর্ব শেষ করলাম।

খাওয়ার পর আমরা সবাই মিলে গেলাম ঝরনা দেখতে। ঝরনা দেখতে যাওয়ার সময় অনেকগুলো সিড়ি বেয়ে নিচে নামতে হয় যার দুই ধারে সুন্দর ফুল গাছ ছাড়াও নানান প্রজাতির গাছ। অনেক কষ্ট করে সিড়ি বেয়ে নিচে নেমে তারপর ঝরনার কাছে পৌছেছি। এতোই ক্লান্ত হয়ে পড়ছিলাম যে, ঝরনায় নামতে সাহস হারিয়ে ফেলেছি। তারপরও নামলাম। জামা-কাপড় ভিজিয়ে উঠে এলাম। স্যারেরাসহ সবাই দারুণ মজা করলাম।

খুব সুন্দর একটা পরিবেশের সৃষ্টি হয়েছিল তখন। ঝরনা থেকে উঠে আবার সিড়ি বেয়ে উপরে উঠতে কতোবার পা পিছলে গিয়েছিল তার ইয়ত্তা নেই।

এরপর শুরু হলো আমাদের সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান। অনুষ্ঠানে কলেজের ইংরেজি বিভাগের অধ্যাপক ও কণ্ঠশিল্পী আখতারুজ্জামান দারুণভাবে গান গেয়েছেন। স্যারের সঙ্গে জনৈকা অতিথি শিল্পীও গান গাইলেন।

অনুষ্ঠানের শেষ পর্বে ছিল লটারি ড্র। লটারিতে সবাইকে পুরস্কার দেয়া হলো।

সব কিছু শেষ করতে প্রায় পাচটা বেজে গেল। তারপর শুরু হলো আসার পালা। সবাইকে নিয়ে আবার বাসে চেপে বসলাম। বাসে আবারও নাশতা হলো।

প্রায় সন্ধ্যা ছয়টায় আমাদের এখানে নামলাম। এই আনন্দ ভ্রমণের স্মৃতি অম্লান থাকবে সবার জীবনে। স্মৃতিময়তার কোনো উপসংহার নেই। তাই স্মৃতির ভাণ্ডারে সঞ্চিত করে রাখবো এই দিনটিকে আজীবন। ইচ্ছা করছিল না সেদিন সেই আনন্দঘন মুহূর্তকে ফেলে আসতে। কিন্তু নিরুপায়, অনিচ্ছা সত্ত্বেও আসতে হলো। এই ছিল আমাদের ইকো পার্ক-এর শিক্ষা সফর। বাড়ি এসেই এর পরিসমাপ্তি ঘটালাম।

মীরসরাই, চট্টগ্রাম থেকে

হজে

- ডা. কায়সার মামুন

এক বছরে দুবার ওমরাহ করে মনে হলো, এবার হজ করা উচিত। প্রথমে ভেবেছিলাম সিংগাপুর থেকেই যাবো। কিন্তু আম্মার সিংগাপুর পারমানেন্ট রেসিডেন্ট স্টেটাস না থাকায় সেটা সম্ভব হলো না। ঠিক হলো ঢাকা থেকে এক পরিচিত মাওলানা সাহেবের বেসরকারি হজ কাফেলার সঙ্গে যাবো।

আবার জন্য দীর্ঘ ছুটি নেয়া কঠিন। তবে আল্লাহর রহমতে ছুটির ব্যবস্থা হলো। মাওলানাকে অনুরোধ করলাম আগে থেকে আমাকে যাওয়া ও আসার তারিখ যেন জানিয়ে দেন। আম্মা, আমার গিন্নি সাঈদা ও দুই বছরের ছেলে সাজিদ আগেই ঢাকা চলে গেল।

মাওলানার গৃন সিগনাল পেয়ে ঢাকা গেলাম তারপর শুরু হলো অপেক্ষার পালা। আমাদের কাফেলার কথা ছিল বাংলাদেশ বিমানে যাবার। বুকিং সেভাবেই দেয়া ছিল। কিন্তু হজ ভিসা পেতে সমস্যা হওয়াতে মাওলানা বাধ্য হয়ে সউদি এয়ারলাইন্সের টিকেট কাটলেন। পাচ দিন অপেক্ষার পর প্লেনে সিট পাওয়া গেল।

আগের রাতে পাসপোর্ট আনতে গিয়ে দেখি আরেক সমস্যা। সাঈদার পাসপোর্টে সাজিদের কথা কিছু লেখা নেই।

মাওলানা বললেন, জেদ্দা এয়ারপোর্টে এটা নিয়ে ঝামেলা হতে পারে। অনেকে হজের মরসুমে ছোট বাচ্চা নিয়ে ভিক্ষা করাতে। তাই এই সতর্ক ব্যবস্থা। মাওলানা আশ্বাস দিলেন, কাল দুপুরে প্লেন ছাড়ার আগেই সউদি দূতাবাস থেকে সাজিদের কথা সাঈদার পাসপোর্টে লিখিয়ে দেবেন।

পরদিন এহরামের প্রস্তুতি নিয়ে সবাই সউদি দূতাবাসে গেলাম। অপেক্ষার প্রহর গুণছি, দেখতে দেখতে চার ঘণ্টা চলে গেল। কিন্তু আমাদের কাজ হলো না। তারপর বাসায় ফিরে এলাম। ভাবলাম ভাগ্যিস ওমরাহর নিয়ত করিনি, তাহলে অনির্দিষ্টকাল এহরামে পরে থাকতে হতো। আমার ছোট ভাগ্নি আমাকে পুরনো দিনের বোম্বাইয়া হাজির স্টাইলে *গুলশানি হাজি* বলে ডাকা শুরু করলো।

দুই দিন পরে পাসপোর্ট হাতে পেলাম, সাঈদার পাসপোর্টে আরবিতে লেখা সাঈদা মামুনের ছেলে সাজিদ কায়সার এই পাসপোর্টে ভ্রমণ করছে। শুধু এটুকু করতে দূতাবাসের দুই দিন লাগলো।

যাহোক, পাসপোর্টের সমস্যা মিটলেও এখন আর প্লেনে সিট পাচ্ছি না। আরো নয় দিন পর অবশেষে প্লেনে সিট পাওয়া গেল।

যারা হজে গিয়েছেন বা কাউকে তুলে দিতে এসেছেন তারা জানেন এয়ারপোর্টে কি অবস্থার সৃষ্টি হয়। তারপরেও সবাইকে দেখলাম হাজিদের সাহায্য করতে।

প্লেনে ওঠার আগে সউদি এয়ারলাইন্সের এক ভদ্রলোকের সঙ্গে আলাপ হলো। সাজিদকে দেখে তিনি আমাদের সবার শেষে প্লেনে তুলে দিলেন। বিজনেস ক্লাসে জায়গা পেলাম। ভ্রমণ ভালোই হলো।

জেদ্দা এয়ারপোর্টে নেমে ইমিগ্রেশন পার হয়ে প্রায় আধা ঘণ্টা হেটে বাংলাদেশ হজ মিশনে এলাম। রাত প্রায় দশটা, কোনো কর্মচারীকে দেখলাম না। ঘণ্টা দুয়েক আগে আসা বেশ কিছু হজ যাত্রীকে দেখলাম ঘুমাচ্ছেন। চারদিকে খোলা বসার জায়গা, এহরামের কাপড়ে শীতে ঠকঠক করে কাপছি।

কয়েকজনের সঙ্গে কথা বললাম। কেউ জানে না কখন মক্কা যাবার বাস আসবে। এক বাঙালি ক্লিনার আমাকে বললেন, মোয়াল্লিম অফিসে রেজিস্ট্রেশন করাতে।

সকাল পাচটার দিকে কয়েকটা আরব ছেলে এলো। পাসপোর্ট রেখে স্টিকার দিল। কিন্তু মক্কা যাবার কি ব্যবস্থা এটা সম্পর্কে কিছুই জানতে পারলাম না।

সকাল সাতটার দিকে শুনলাম বাস আসছে। রামপুরা বনশ্রীর এক মসজিদের ইমাম বিরাট হজ কাফেলা নিয়ে এসেছেন। মোয়াল্লিমের অফিসে এলাম।

কিন্তু আমাদের জন্য ভাড়া করা বাসায় কিভাবে যাবো? বাঙালির ট্যাকসি নিলাম, মোয়াল্লিম অফিসের লোক বুঝিয়ে দিল আমাদের কোথায় নামতে হবে। তবে কপাল খারাপ থাকলে যা হয়! ট্যাকসি আমাদের ভুল জায়গায় নামিয়ে দিয়ে চলে গেল।

লাগেজ, বাচ্চা নিয়ে আরো আধা ঘণ্টা হেটে গন্তব্যে পৌছালাম। ঢাকা থেকে মক্কার বাসায় পৌছাতে চব্বিশ ঘণ্টার বেশি লাগলো। অথচ ঢাকা থেকে বিমানে আঠারো ঘণ্টায় নিউ ইয়র্ক যাওয়া যায়।

আমাদের জন্য ভাড়া করা বাসা দেখে অবাক হলাম। পাহাড়ের উপরে তৈরি খুব নড়বড়ে বাসা, শুনলাম হজের পরেই এটা ভেঙে ফেলা হবে। ছোট একটা রুমে আম্মা ও সাঈদার জায়গা হলো। আরেকটা রুমে আমি আরেকজনের সঙ্গে শেয়ার করে থাকবো। রুমের অবস্থা যাই হোক প্রাইভেসি পাচ্ছি এতেই আমি খুশি। বহুলোক দেখলাম ছোট ছোট রুমে দশ বারোজন করে থাকছেন।

দুই দিন পরে মিনাতে গেলাম। আমাদের কাফেলার দুইটা তাবু। টয়লেট ও পানির সুন্দর ব্যবস্থা। এখানে এসে মাওলানা সবাইকে কিছু টাকা ধরিয়ে দিয়ে নিজেদের খাবার ব্যবস্থা করে নিতে বললেন।

আগে বলা হয়েছিল, ঢাকা ছেড়ে যাবার পর আবার ঢাকা ফিরে আসা পর্যন্ত থাকা ও খাওয়ার দায়িত্ব হজ কাফেলার। মিনাতে খাবারের তেমন ভালো দোকান নেই। এই সুযোগে মোয়াল্লিম অফিসের লোক চড়া দামে খাবার কুপন বিক্রি করছে। তিন বেলা খাবার বিক্রি হবে।

আমাদের জন্য আর্থিক দিকটা কোনো সমস্যা নয় বলে আমরা কুপন কিনে খাবার নিলাম। কিন্তু বাকি হাজিরা যখন চিড়া আর গুড় খেয়ে থাকছিলেন তখন খুবই খারাপ লাগলো। এতোদিনে বুঝলাম সবাই কেন পোটলা ভরে চিড়া–গুড় নিয়ে হজে আসে। অনেক হাজিকে দেখলাম রাস্তার ওপর থাকছেন। অনেকে সউদি সরকারের অনুমতি ছাড়াই হজে এসেছেন সউদি আরবের অন্যান্য জায়গা থেকে। তাই তাদের তাবু দেয়া হয়নি।

হজের দিন শেষ রাতে আরাফাতে এলাম। নিয়ম হলো সূর্য ওঠার পর আসতে হবে। কিন্তু ভিড় এড়াতে এই ব্যবস্থা। অস্থায়ী তাবুতে সকাল থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত থাকা। অনেকের তাবু নেই। কিন্তু বড় বড় নিম গাছে আরাফাতের ময়দান ছায়াময়। প্রয়াত রাষ্ট্রপতি জিয়াউর রহমান এই নিম গাছগুলো সউদি সরকারকে উপহার দিয়েছিলেন। খুব অল্প পানিতে এই গাছ বড় হয়। সেই মানুষটি আজ নেই। তবে নিম গাছগুলো প্রতি বছর হাজিদের ছায়া দিচ্ছে। আরাফাতের ময়দানে অবস্থান হজের প্রধান কাজ। খালি পেটে ইবাদত করা তো আর সম্ভব নয়! আমাদের কাফেলার লোক আমাদের খাওয়ানোর দায়িত্ব ছেড়ে দিয়েছেন।

মোয়াল্লিমের অফিস থেকে বিরিয়ানি পাঠানো হলো সকাল, দুপুরে। যখন সেটা বিতরণ হলো, তীব্র গরমে সেটা পচে গিয়েছে। বিভিন্ন সউদি সংগঠন আরাফাতে এসে খাবার ও পানি বিলি করেন। বাংলাদেশের অভুক্ত হাজিরা এসব খেয়েই সময়টা পার করেন।

আরাফাতে সন্ধ্যা হতেই আমাদের মুজদালিকা যাবার পালা। ওখানে রাত কাটাতে হবে মিনা ফেরার আগে। বহু সময় অপেক্ষার পরেও আমাদের নিতে বাস এসেছে। এক সময় দেখি মাওলানা আর তার সহযোগীরা নিখোজ। আরাফাতের ময়দান খালি হয়ে যাচ্ছে।

শেষে আমরা তিনটা পরিবার একটা মাইক্রোবাস ভাড়া করে মুজদালিকা এলাম। এখানে রাস্তার পাশে চাদর বিছিয়ে শুয়ে পড়লাম। খুব ভালো ঘুম হলো।

সকালে উঠে মিনা ফেরার পালা। আমরা কোনো গাড়ি না পেয়ে একটা ট্রাক ভাড়া করলাম। বেশ কয়েকবার রাস্তা হারিয়ে মিনায় এলাম। পুলিশ গাড়ি থামতে না দেয়ায় আমাদের নামতে হলো মিনার শেষ প্রান্তে।

এবার তাবু কিভাবে খুজে পাবো? কেউই তাবুর নাম্বার জানে না। প্রথম দিন মিনাতে এসে লক্ষ্য করেছিলাম তাবুর মাথায় একটা কালার কোড নাম্বার লেখা, এটা আমি সাঈদাকেও দেখিয়েছি। মনে হলো এটাই তাবুর নাম্বার। রাস্তার পাশে ম্যাপ থেকে তাবু খুজে বের করে রওনা হলাম তাবুর দিকে। সঙ্গে প্রচুর স্বেচ্ছাসেবক দেখলাম। কিন্তু কেউই আরবি ছাড়া অন্য ভাষা কিছু বলতে পারে না।

মিনাতে হাটার খুবই সমস্যা, রাস্তায় অসংখ্য লোক। তাবুর প্রায় কাছে চলে এসেছি। একটা সরু রাস্তা দিয়ে কিছুটা গেলেই আমাদের তাবু। এ সময় বিপদে পড়লাম, সরু একটা রাস্তার মাঝে দুটো বাস নষ্ট হয়ে পড়ে আছে। দুদিক থেকে হাজার হাজার লোক যাওয়া-আসা করছে।

কিছু লোক শয়তানকে পাথর মারতে যাচ্ছে। বাকিরা তাবুতে ফিরছে। এই বিপরীতমুখী স্রোত আর বিকল্প বাসের কারণে রাস্তা প্রচণ্ড চাপ সৃষ্টি হলো।

আমি সামনে হাটছি। এহরামের কাপড় পরা। দুহাতেই লাগেজ, কিছুটা পেছনে আম্মা, পাশে সাঈদা কোলে সাজিদ, হঠাৎ মনে হলো ভিড়ের চাপে আমার পা রাস্তা থেকে উপরে উঠে যাচ্ছে। সাঈদার ডাক শুনে পেছনে ফিরে দেখি তারাও ভিড়ের চাপে পড়েছে। মনে হলো আম্মা ও সাঈদা যে কোনো সময় পড়ে যাবে। পেছনে ফিরে তাদের কাছে যাওয়ার চেষ্টা করেও ব্যর্থ হলাম। জীবনে নিজেকে এতো অসহায় কখনো মনে হয়নি। ভাবলাম অর্থ, সম্পদ, প্রভাব-প্রতিপত্তি ইত্যাদি কোনো কাজেই আসে না। এই মুহূর্তে আল্লাহর রহমত না হলে নিশ্চিত মৃত্যুর হাত থেকে আমার আম্মা, স্ত্রী ও ছেলেকে কেউ বাচাতে পারছে না।

আম্মা কেদে উঠলেন।

আল্লাহর রহমত কখন কিভাবে আসে সেটা আমাদের মতো নগণ্য মানুষের পক্ষে বোঝা কঠিন। হঠাৎ দেখি আম্মার কান্না শুনে চার পাচজন বিশালদেহী আফ্রিকান হাজির। আম্মা ও সাঈদাকে ঘিরে ফেলে ভিড়ের চাপ থেকে বাচালেন, তারপর তাদের রাস্তার এক পাশে সরিয়ে নিরাপদে রেখে চলে গেলেন। আমি এই সোনার মানুষগুলোকে কৃতজ্ঞতা জানানোর আগেই তারা নিজেদের পথে চলে গেলেন।

হজের শেষে এবার মদিনা যাবো। মক্কা থেকে মদিনা যেতে পাচ ছয় ঘণ্টা লাগে। মাঝ রাতে বলা হলো বাস আসছে। রাস্তায় দুই ঘণ্টা অপেক্ষার পর বাসে উঠলাম। হজ অফিস দিকে ক্লিয়ারেন্স নিয়ে বাস মদিনার দিকে যাত্রা করলো। বাসের ড্রাইভার ইজিপশিয়ান। এরা হচ্ছে মরসুমি ড্রাইভার। শুধু হজের সময় গাড়ি চালাতে আসে। ইজিপ্টের আরবি ছাড়া আর কিছু বোঝে না।

ঘণ্টা তিনেক বাস চলার পর দেখি বাস মক্কার আয়েশা মসজিদের কাছে এসেছে। বুঝলাম আমরা পথ হারিয়েছি। ভাষা সমস্যার কারণে ড্রাইভারকে কিছু বলতেও পারি না। ইশারায় ড্রাইভারকে বললাম জেদ্দার দিকে যেতে। কিছুটা গিয়েই মদিনার এক্সপ্রেসওয়ে-র দেখা মিললো। আঠারো ঘণ্টা পরে আমরা মদিনা পৌছালাম।

গত কিছু দিনের তিক্ত অভিজ্ঞতার কারণে সহযাত্রীরা ঠিক করলেন মদিনা থেকে কিছুটা আগে আমরা রওনা হবো জেদ্দার উদ্দেশ্যে। এবার আর পথ হারালাম না। প্লেন ছাড়ার বারো ঘণ্টা আগে এসে জেদ্দা এয়ারপোর্টে বসে থাকতে হলো।

জেদ্দা থেকে ঢাকা ফেরার ফ্লাইটটি ছিল আমার জীবনের সবচেয়ে কঠিন ফ্লাইট। আমাদের হাজিদের অনেকেই হয়তো অনভিজ্ঞতার কারণে কিছু ঘটনা ঘটিয়েছেন। কিন্তু সউদি এয়ারলাইন্সের ফ্লাইট ক্রুর দুর্ব্যবহার ক্ষমার অযোগ্য।

হজের অভিজ্ঞতায় মনে হলো, এর সঙ্গে সংশ্লিষ্ট কেউ-ই দায়িত্ব পালন করে না। বেসরকারি হজ কাফেলার লোক হাজিদের কাছ থেকে টাকা নেয়ার সময় ভুল করে না। কিন্তু প্রয়োজনে তাদের খুজে পাওয়া যায় না।

সবচেয়ে চড়া দামে বাংলাদেশের হাজিরা প্লেনের টিকেট কেনে। কিন্তু সউদি এয়ারলাইন্সের ক্রুদের ব্যবহার দেখে মনে হলো এরা আমাদের বিনা পয়সায় আনা–নেয়া করছে।

মোয়াল্লিমদের উদাসীনতা, যথাযথ লজিসটিকসের অভাবের জন্য ধর্ম মন্ত্রণালয় এবং জেদ্দায় বাংলাদেশি দূতাবাসের কিছু করার নেই। কাজেই মনে হয় দূতাবাসের লোকদের দেখলাম শুধু ভিআইপি হজযাত্রীদের সেবা দিতেই ব্যস্ত। হাজিদের প্রস্তুতি নিয়েও হয়তো কিছু সমস্যা হয়। মিনাতে বসে অনেককে দেখলাম হজের করণীয় নিয়ে বিতর্ক করতে। মনে হয় হাজিদের জন্য হজের ওপর কিছু ফর্মাল ট্রেনিংয়ের ব্যবস্থা থাকলে ভালো হয়। বর্তমানে যা আছে এটা যথেষ্ট নয়। এবং খুব বেশি শারীরিকভাবে দুর্বল হবার আগেই আর্থিক সঙ্গতি হলে হজ শেষ করা উচিত।

আপনারা যখন এই লেখাটি পড়ছেন তখন রোজার ঈদ এসে গিয়েছে। পরবর্তী হজের আর দুই মাসের মতো বাকি। বাংলাদেশের ধর্ম মন্ত্রণালয় খুব সম্ভব এখনো হজের বিস্তারিত প্রস্তুতি নেয়নি। বেসরকারি হজ কাফেলারা চুপচাপ বসে আছে। একেবারে শেষ সময়ে এসে এদের কর্মতৎপরতা শুরু হবে। ফলে বাংলাদেশি হাজিদের থাকতে হবে নড়বড়ে ভাঙা বাড়িতে। অসীম কষ্ট সহ্য করতে হবে হজের সব আনুষ্ঠানিকতা সম্পন্ন করতে। সবচেয়ে বেশি দাম দিয়ে প্লেনের টিকেট কিনে বিদেশি এয়ারলাইন্সের বিদেশি কর্মীদের দাত খিচুনি এবং দুর্ব্যবহার সহ্য করতে হবে। অথচ বাংলাদেশ তৃতীয় বৃহত্তম মুসলিম দেশ।

ভাবুন সিংগাপুরের কথা। ছোট এই দেশের জনসংখ্যার মাত্র শতকরা পনেরো ভাগ মুসলমান, কোনো ধর্ম মন্ত্রণালয় নেই। কিন্তু সম্ভাব্য হজযাত্রীরা অন্তত এক বছর আগে থেকে জানেন কোন বছর তারা হজে যাচ্ছেন। রোজার ছয় মাস আগে থেকে প্রতি রবিবার হজের ওপর ট্রেনিং হচ্ছে। সঙ্গত কারণেই আশা করা যায়, সিংগাপুরের হাজিরা সামনের হজে সুন্দরভাবে সব কিছু শেষ করে সুস্থ শরীরে দেশে ফিরবেন। এবং বাংলাদেশের হাজিরা বিশাল ধর্ম মন্ত্রণালয়, জেদ্দাতে বিশাল দূতাবাস থাকা সত্ত্বেও পদে পদে বিড়ম্বনার সম্মুখীন হবেন।

প্রশ্ন হলো, এই দুঃসহ অবস্থার কি শেষ নেই?

সিংগাপুর থেকে

অপরাধী

- শিলা

আমার এই ছোট জীবনে সুখটা খুব কম পেয়েছি, দুঃখটা বেশি। তাই তো সব সময় ভয় হয়, এই বুঝি আবার দুঃখের সময় ঘনিয়ে এলো। আমার মেয়ে রোদশীর বয়স আগামী মাসে তিন বছর পূর্ণ হবে। অসাধারণ এই মেয়েটি অনর্গল কথা বলার ক্ষমতা নিয়ে এসেছে সে এই পৃথিবীতে। ভীষণ দুষ্টু আর চঞ্চল। আজ আমি লিখবো শুধু তাকে নিয়েই।

২০০১ সালে তৃতীয়বার কনসিভ করি। প্রথম ও দ্বিতীয়বার অ্যাবরশন করে ফেলি আমার বিভিন্ন রকম অসুবিধার কারণে। তৃতীয়বার যখন আবার কনসিভ করি তখনো এই নিষ্পাপ শিশুটিকে এ পৃথিবীতে আনতে চাইনি কোনো কারণ ছাড়াই। মনে মনে চেয়েছিলাম প্রাকৃতিকভাবে গর্ভ নষ্ট হোক। তাই স্বামীর সঙ্গে মোটর সাইকেল জার্নি করেছিলাম রাজশাহী থেকে নাটোর পর্যন্ত। এমনকি ওষুধ পর্যন্ত খেয়েছিলাম। সব কিছু ব্যর্থ হয়ে গেল।

অবশেষে দীর্ঘ নয় মাস পর এক কন্যা সন্তানের মা হলাম।

প্রথম মা হওয়ার অনুভূতি পৃথিবীর কোনো কিছু সঙ্গে তুলনা করা যায় না। আমার কোল জুড়ে এলো একটি ছোট্ট ফুটফুটে মেয়ে। এখন তার মুখের দিকে তাকিয়ে সমস্ত দুঃখ–কষ্টকে ভুলে যেতে পারি নিমেষেই। আমার একটু মন খারাপ সে মেনে নিতে পারে না এ বয়সেই, কি যে ভালো লাগে!

আমার এই মায়াবী মেয়েটিকে ভীষণ ভালোবাসি। কিন্তু যখনি মনে হয় তাকে আসতে দিতে চাইনি এই সুন্দর পৃথিবীতে তখনি ভীষণ অপরাধী মনে হয় নিজেকে। ধিক্কার দিতে ইচ্ছা হয় এই আমাকে। মায়ের কাছে সন্তানের নিবিড় সম্পর্কের কাছে হার মেনেছি।

আমি চাই, আমার মেয়ে অনেক অনেক বড় হবে। আমার অনেক স্বপ্ন, আশা আর আকাঙ্ক্ষা পূরণ করবে। তাকে হারাতে চাই না কিছুতেই। তাকে নিয়েই যে আমার কাটে সারা দিন, সারা বেলা।

পূর্ণ ঠিকানা বিহীন, রাজশাহী কোর্ট থেকে

নতজানু

- মণিকা

সত্যি সত্যিই যে এমনটা হতে পারে বা হবে, কখনো ভাবেনি সে। যদিও আশংকা ছিল একশর মধ্যে প্রায় নব্বই পারসেন্ট তবুও অবুঝ নারী হৃদয় আশংকাকে উড়িয়ে দিয়ে ভালোবাসার বিশ্বাসকে আকড়ে ধরে রেখেছিল। ভেবেছিল, সত্যিকার ভালোবাসা কখনো বিশ্বাসকে ভাঙতে পারে না। সত্যিকার ভালোবাসা নিরুদ্বেগে চলে। কিন্তু ভালোবাসা আর বিশ্বাস সব সময় যে, একমুখী নয়, দ্বিমুখী। এবং প্রবল ভালোবাসা বন্যার মতোই বিশ্বাসকে ভাসিয়ে নিয়ে যেতে পারে। এ ধরনের চিন্তা ধারা কেন যে তার মতো ধীরস্থির, বুদ্ধিমতী, বাস্তববাদী, মধ্য বয়সী মহিলার ছিল না, তা কে বলতে পারবে!

হতে পারে জীবনে প্রথমবারে পাওয়া ভালোবাসাকে সে নিজে আকণ্ঠ পান করেছিল তৃষিতের মতো, পূর্বাপর ভবিষ্যতে কোনো কিছু না ভেবেই অথবা ভালোবাসা প্রাপ্তিকে সে চূড়ান্ত বলে মনে করেছিল। এবং যে কোনো কিছু তার কাছে তুচ্ছ বলে মনে হয়েছিল।

কিন্তু সত্যি সত্যিই যখন ভালোবাসা ভাঙলো বিশ্বাসের ভিতকে উপড়ে নিয়ে তখন নিজের রিক্ত আর বিধ্বস্ত কাঠামো নিজেকে দাড় করিয়ে দিল এক অবিশ্বাস্য রকম কষ্ট এবং অপমানের কাঠগড়ায়। নিজের বন্ধুবান্ধব, আত্মীয়স্বজনের কৌতুক এবং উপহাসের চেয়ে বেশি বাজলো নিজেরই আত্মজা–র ঠোঁট বাকানো শ্লেষ মাথা ভ্রূকুটি। নিজের কাছে নিজেকে যে কি রকম খেলো, তুচ্ছ ও নগণ্য বলে মনে হচ্ছে সেটা আমল না দিয়ে তখন নিজের আত্মার চেয়ে বেশি প্রিয় অষ্টাদশী মেয়ের ওই নীরব উপহাস মনে হচ্ছিল মর্মান্তিক শেল–এর মতো।

বত্রিশ বছরের পরিপূর্ণ যৌবনে স্বামী যখন মারা গেল ক্যান্সারে তখন দশ বছরের মেয়ে আর চার বছরের ছেলেকে নিয়ে দিশাহারা জীবন তার। স্বামীর অফিসে অনেক চেষ্টা–তদবির ও অবহেলা সহ্য করে খুব সাধারণ মানের একটা চাকরি পেয়ে মনে হয়েছিল বাচা গেল। জীবনে যে আরো কিছু পাওয়ার থাকতে পারে তা তখন ধারণার বাইরে ছিল।

চাকরির পাশাপাশি নিজেকে আরো একটু সমৃদ্ধ করে তোলার বাসনা নিয়ে ভর্তি হলো স্থানীয় একটা কমপিউটার ট্রেনিং সেন্টারে। সেখানেই পরিচয় ঘটলো এক অনাস্বাদিত পূর্ব অভিজ্ঞতার প্রেমের। স্বামীকে সে পেয়েছিল পারিবারিক সম্বন্ধের মাধ্যমে। দৈনন্দিন অভ্যাসের মতোই জড়িয়ে ছিল স্বামীসঙ্গ। সেখানে প্রেম বা ভালোবাসার অনুষঙ্গ ছিল না। স্বামীকে তেমন একটা ভালোবাসতে পারেনিও সে কিছুটা বয়সের পার্থক্যের

জন্য। কিছুটা স্বামীর সঙ্গে নিজের মতের অমিল বা পছন্দের অমিল থাকার কারণে। বস্তত তার বিবাহিত জীবন ছিল মেনে নেয়া এবং মানিয়ে নেয়ার সঙ্গে নিরাপদ ও শান্তিপূর্ণ সহঅবস্থানে।

সে জন্য স্বামীর মৃত্যু তার কাছে মনে হয়েছিল নিরাপদ আচ্ছাদন সরে যাওয়ার মতো। কারণ স্বামীর মৃত্যু মানে ছোট ছেলেমেয়ে নিয়ে নিরাপত্তাহীন এক নিদারুণ আর্থিক কষ্টের মধ্যে পড়া।

কোনো মতে চাকরিটা হয়ে যাওয়ায় অন্তত আর্থিক বিপদ থেকে রক্ষা পাওয়া গেল মনে করে যখন সে নিশ্চিন্ত ছিল তখনই ভালোবাসা এলো জোয়ারের মতো। অপূর্ব রূপসী তরুণীকে কোনো মতেই মনে হতো না দুই সন্তানের মা বলে। কিন্তু ভালো যে বাসলো, সে ভালোবাসলো সব কিছু জেনেশুনেই। তার সব কষ্ট এবং একাকীত্বকে ভাগ করে নেয়ার প্রতিশ্রুতি দিয়ে ভালোবাসলো সে।

অকালে বিধবা হওয়া তরুণীটি সেই প্রতিশ্রুতিতে ভুলে গেল সব কিছু। সারা দিন অফিস করে সন্ধ্যায় ওই কমপিউটার স্কুলের সময়টুকু যেন তার কাছে মনে হতে লাগলো মরুভূমির মাঝে মরুদ্যানের মতো। প্রেমিক যে তার চেয়ে বয়সে বেশ কয়েক বছরের ছোট, পারিবারিক বন্ধনের দিক থেকে ভবিষ্যতে যে কোনো ধরনের বাধা আসতে পারে এ বিষয়ে যথেষ্ট সচেতন ছিল সে। বার বার সে প্রেমিককে জিজ্ঞাসা করতো এসব কথা।

কিন্তু বাধ ভাঙা জোয়ারের প্লাবনকে নিয়ে যে তার জীবনে এসে দাড়ালে। সে ওসব বাধাকে উড়িয়ে দিল হেসেই। তার কথা হচ্ছে, পরিবারের বাধায় কি এসে যায় ভালোবাসি তোমায়, তোমার সব অসম্পূর্ণতাসহ সব কিছুকে মেনে নিয়ে। প্রেমিকের আশ্বাসে নিশ্চিন্ত ছিল সে। যদিও মাঝে মধ্যে ঠিকই প্রশ্ন করতো নিজের মনকে। ঠিক করছি তো? কোথাও কোনো ভুল করছি না তো? আসলে ভালোবাসার জন্য কাঙাল ছিল সে আজীবন। স্বামীর কাছে সে ঠিক ভালোবাসা পায়নি, পেয়েছিল স্ত্রীত্ব এবং সংসার। এ জন্যই হয়তো বা গল্প–উপন্যাসে পড়া প্রেমের মতো প্রেম যখন তার জীবনে এলো, নিজেকে ঠিক ধরে রাখতে পারেনি সে। ভালোবাসায় নিমজ্জিত হলো আকণ্ঠ।

জানাজানি হলো অচিরেই। প্রথমে ভাই–ভাবীসহ পরিবারের লোকজন, তারপর অন্যরা। কিশোরী হয়ে উঠতে থাকা মেয়ের চোখেমুখে দেখা দিল সন্দেহ আর ভয়। ভয়, বাবার স্থানে অন্য কেউ আসবেন কি না বা মা সত্যিই অন্য জীবনে প্রবেশ করবেন কি না এসব নিয়ে সন্দেহ, কেন মায়ের কাছে ওই লোকটি আসবেন বা মা কেন ওই লোকটির সঙ্গে কথা বলবেন। ছেলে যেহেতু ছোট, তার ওসব নিয়ে মাথা ঘামানোর প্রশ্ন নেই। কিন্তু মেয়ে যতোই বড় হয়ে উঠতে লাগলো ততোই প্রশ্নমুখর হয়ে উঠতে লাগলো কখনো প্রকাশ্যে, কখনো অপ্রকাশ্যে।

এভাবে সিদ্ধান্তহীনতায় চলে গেল বেশ কয়েক বছর। তরুণীটি এখন আর তরুণী নেই। রীতিমতো মধ্য বয়সে (প্রায় চল্লিশ) পৌছে গেছে সে। তার সেই প্রেমিক পাড়ি জমালো বিদেশে। বিদেশ থেকেও সে ভালোবাসা ও ঘর বাধার প্রতিশ্রুতি দিয়ে চললো অবিরাম।

তার সমস্যা হয়ে দাড়ালো তার অষ্টাদশী মেয়ে। মেয়ে কিছুতেই মেনে নিতে পারছিল না মন থেকে। আধুনিক মায়ের মতো মেয়ের সঙ্গে সব কিছু আলোচনা করে সে স্থির করতে চেয়েছিল। বাদ সাধলো মেয়ের অনড় মনোভাব।

তার কথা হচ্ছে, তুমি কি খুব খারাপ আছো? কেন তোমাকে অন্য ধরনের চিন্তা করতে হবে? আমার বা আমার ভাইয়ের চেয়ে তোমার কাছে ওই লোকটার গুরুত্ব বেশি?

মেয়ের যুক্তির কাছে হার মানতে না চাইলেও শেষ পর্যন্ত বাধ্য হলো সে। তার মানসিক মুক্তির আকাশকে নিজের হাতে গুটিয়ে দিয়ে বন্ধ করতে শেষ পর্যন্ত প্রবল চেষ্টা চালিয়ে সফল হলো সে। প্রেমিককে জানিয়ে দিল, সে কোনো মতেই পারবে না, নতুন জীবন শুরু করতে। অন্য পাচটা সাধারণ বাঙালি মেয়ের মতোই

নতজানু হলো মেয়ে এবং চেনা-জানা আত্মীয়, বন্ধুদের ইচ্ছার কাছে। তারা কেউ তার মনের খোজ নিল না। কেউ বুঝতে চাইলো না তার মর্মান্তিক যন্ত্রণায় রক্তাক্ত হওয়াটা।

বাঙালি মেয়েরা বিধবা হলে কেউ সহজে মেনে নেয় না তার আবার নতুন করে জীবন শুরু করার ইচ্ছাটাকে। তার আপাত প্রগতিশীল চিন্তার ধারক বাবা-মা, ভাই-ভাবী, বন্ধুরা কেউ তাকে নতুন জীবন আরম্ভ করার জন্য উৎসাহ তো দিলই না, বরং ছেলেমেয়ে মানুষ করে তুলতে পরামর্শ দিল। তার কথা কেউ ভাবলো না।

আর তার প্রেমিক?

সেও ভুল বুঝলো তাকে। তার পারিবারিক সমস্যা সে বুঝতে চাইলো না।

সব কিছু ছেড়ে-ছুড়ে তার হাত ধরে নতুন জীবন কেন শুরু করা তার পক্ষে সম্ভব না এটা সে তার প্রেমিককে কিছুতেই বোঝাতে পারলো না। তার দুঃসহ যন্ত্রণা তাকে একাই ভোগ করতে হলো।

সে কিছুতে মেনে নিতে পারছে না তার মেয়ের এই কঠোর মনোভাব। যাকে সে গর্ভে ধারণ করেছে, ছোট এতোটুকু রক্তের পুটুলি থেকে আজ আঠারো বছরের তরুণীতে পরিণত করেছে তিল তিল করে সে তার কষ্টটা বুঝবে না এটা সে কিছুতেই নিজের মনকে বোঝাতে পারছে না।

আজ সে তার প্রেমিকের পাঠানো বিয়ের কার্ড পেয়েছে ডাকে। তাই নিয়ে বসে আছে তার ঘরের জানালায় মুখ রেখে। তার শুধু মনে পড়ছে মেয়েকে গর্ভে ধারণ করার সময়টা, মেয়ের জন্ম, ছেলের জন্ম, স্বামীর ক্যান্সার ধরা পড়া, তারপর মৃত্যু, চাকরির জন্য একে-ওকে-তাকে ধরাধরি, প্রবল জীবন-সংগ্রামের মাঝেও মেয়ে আর ছেলের স্কুল ও পড়াশোনার পেছনে তার সময় দেয়া সব কিছু।

আজ সে অফিসে যায়নি। বসে নিজেকে নিয়ে ভাবতে। তার শুধু মনে হচ্ছে, জীবনের কাছে কি তার মতো মেয়েদের কিছু চাওয়ার নেই? না কি তার মতো মেয়েদের কিছু চাইতেই নেই?

উত্তরা, ঢাকা থেকে

মহানায়ক

- মেহের আমজাদ

আমার পরানের পরান কদম আলী যার কদম ছাট চুল, মুখে এক ফালি কালো কুচকুচে গোফ আর গায়ের রঙ যেন দুধে-আলতায় মেশানো। লোকে শুধু নারীদেরই রূপ দেখে এবং বিভিন্ন গুণের প্রশংসা করে বেড়ায়। কিন্তু পুরুষদেরও তো রূপ থাকতে পারে! এই যেমন আমার পরানের পরান মানে আমার স্বামী কদম আলীর রূপের প্রশংসা না করে আমি পারি না যেন বর্ষার ফোটা কদম ফুল। তাই তো ওকে অনেক সময় আদর করে *কদম ফুল* বলে ডাকি।

তবে আমিই যে শুধু তার রূপের প্রশংসা করি ঠিক তা নয়, আমার স্বামী কদম আলীর সঙ্গে আমাকে যে দেখে সেই বলে অমন সুন্দর রূপের স্বামী কতোজন মেয়েরই বা ভাগ্যে জোটে!

আসলে নারীদের মতো যদি *বিশ্ব সুন্দর* প্রতিযোগিতার ব্যবস্থা থাকতো পুরুষদের ক্ষেত্রে তাহলে আমার পরানের পরান কদম আলী নির্ঘাত সে প্রতিযোগিতায় প্রথম স্থান অধিকার করতো। তাই বলতে দ্বিধা নেই, আমার নারী জীবন সার্থক।

কিন্তু ভয় হয়, কোনো ছলনাময়ী যদি তার রূপে পাগল হয়ে তাকে ভাগিয়ে নিয়ে যায়! আমি যেমন তার রূপে পাগল হয়ে ঘর ছেড়েছিলাম। আমি তো তাকে সব সময় আমার আচলের তলায় রাখতে চাই। সে যে পুরুষ মানুষ, তাকে অফিস করতে হয়, নানান কাজে বাইরে বের হতে হয়।

এই তো সেদিন এক মেয়ে, মানে মেয়ে বলতে বড়জোর বাইশ তেইশ বছরের উপরে বয়স হবে না। মোটামুটি দেখতে সুন্দরী। ওই মেয়ে নাকি তার অফিসের সহকর্মী। আমাদের বাসায় বেড়াতে এসে যে রকমভাবে তার

দিকে ড্যাব ড্যাব করে তাকাচ্ছিল আর ইশারা–ইঙ্গিত করছিল তাতে আমার মনে হয়নি একই অফিসে চাকরি করে। পরে অবশ্য খোজ–খবর নিয়ে জেনেছি এতে সন্দেহের অবকাশ নেই।

কিন্তু একই অফিসে চাকরি করে তার সহকর্মী সম্পর্কে মেয়েটি কিছু জানবে না তা কি কেউ বিশ্বাস করবে! যার সঙ্গে প্রতিদিন অফিসে দেখা হচ্ছে, নিশ্চয় কিছু না কিছু কথাও হয়। তারপরও...। বুঝেছি তার রূপে পাগল হয়ে প্রেমে পড়েছে। এ প্রেম যে বেশি দিন টিকবে না সে হুশ কি এ মেয়ের হয়নি যার বৌ আছে, ঘর–সংসার আছে! পরে অবশ্য অনেক ভেবেচিন্তে উদ্ধার করেছি। বার বার মনে হয়েছে রবীন্দ্রনাথের সেই বিখ্যাত গানের কথা – *আমি জেনেশুনে বিষ করেছি পান*।

এরপরও তার সহকর্মী মানে ওই মেয়ে সব জেনেশুনে এ বাসায় আবার যখন এলো এবং ঘন ঘন যাতায়াত শুরু করলো আমি তখন বাধ্য হয়ে আমার মিনসে কদম আলীকে বলে দিলাম, দেখো, এভাবে এমন একটা যুবতী মেয়েকে নিয়ে যদি বেশি বাড়াবাড়ি করো তাহলে তোমার অফিসে জানিয়ে দেবো।

এরপর থেকে আর ওই মেয়ে আসেনি।

এ ঝামেলা মিটতে না মিটতেই আমাদের পাশের ফ্ল্যাটে ভাড়াটে হয়ে এলো এক নতুন বৌ। মাস খানেক যেতে না যেতেই আমাদের বাসায় এসে আমার সঙ্গে যেচে আলাপ শুরু করে দিল।

কয়েকদিন বাদে জানলাম তার স্বামী নাকি ব্যবসার কারণে বেশির ভাগ সময় বাইরে কাটায়। ভাবলাম ভালোই হলো। আমারও তো অফিসে যাওয়ার পর একা কাটাতে হয়। গল্প–গুজবে সময় কাটবে।

প্রথম দিকে ওই নতুন বৌ–এর আসা–যাওয়া ভালো লাগলেও এখন দেখছি অন্য রকম ভাব। আমাকে রেখে আমার মিনসে কদম আলীর সঙ্গেই দেখি আলাপ জমাতে বেশি পছন্দ করছে। আবার দুলাভাই, দুলাভাই করে যেন বেহুশ হয়ে পড়ে। বুঝলাম নতুন বৌটার এ আলামত তো ভালো নয়। বলা তো যায় না কোন সময় কি ঘটে যায়!

ইদানীং আবার সময় অসময়ে আমাদের বাসায় যাতায়াত বেড়েছে। দুলাভাই দুলাভাই, করে যেসব ইয়ার্কি, ঠাট্টা আমার চোখের সামনে করে চলেছে তাতে আমার মনে হচ্ছে, এ বাসায় যেন রাধা–কৃষ্ণের প্রেমলীলা চলছে।

না। এসব বেলেল্লাপনা আর তো হতে দেয়া যায় না, এই ভেবে সেদিন আমি রান্নাঘরে ঢুকেছি রান্না করতে। ওই নতুন বৌটা কখন যে বাসায় ঢুকেছে তা খেয়াল করিনি। হালকা হাসির শব্দে টের পেলাম নতুন বৌটা এসেছে। কৌতূহলবশত নিজেকে আড়াল করে দেখছি আমার মিনসে তার হাত ধরে প্রেমিক যুগলের মতো বসে আছে। ওই নতুন বৌটা ফিশফিশিয়ে কি যেন বলছে।

এরপর আর চোখে দেখা যায় না। তখন রাগে–ক্ষোভে আর স্থির থাকতে না পেরে তাদের সামনে গিয়ে চেচিয়ে মহল্লা মাথায় করে ফেললাম।

আমার এমন চেচামেচির শব্দে আমাদের বাড়িওয়ালাসহ আশপাশ থেকে কিছু ছেলে–ছোকরা এবং মেয়ে মানুষও জুটে গেল। সে এক বিশ্রী কাণ্ড।

বাড়িওয়ালা ব্যাপারটা বুঝে আমার মহানায়ক মিনসেকে শুধু হাতে ছুয়ে মারলেন না, কড়া মেজাজ দেখিয়ে বললেন, বেচে গেলেন শুধু আমার ভাড়াটে বলে। তবে আপনার মতো ভাড়াটে আমার আর দরকার নেই। আপনি আগামী মাসেই বাসা দেখে এ বাসা ছাড়ুন।

অবশ্য এমনটিই চেয়েছিলাম যাতে মিনসের আক্কেল–জ্ঞান হয়। এরপর একান্ত বাধ্য হয়ে মিনসে তো বাসা বদল করলো।

নতুন বাসায় এসে কয়েক মাস ধরে বেশ ভালোই আছে। কোনো ঝুট–ঝামেলা নেই বলেই তো মনে হচ্ছে।

তবে এ বাসার বাড়িওয়ালার ইউনিভার্সিটি পড়ুয়া মেয়েটা মাঝে মধ্যে দেখি আদেখলার মতো ড্যাব ড্যাব করে আমার মিনসের দিকে চেয়ে থাকে।

আসলে সত্যি কথা বলতে কি, আমার মিনসের রূপ যেন দিন দিন বৃদ্ধিই পাচ্ছে। তাকে দেখে কেউ সহজে বলবে না যে, তার বিয়ে হয়েছে। মানে সেই যাকে বলে চিরসবুজ, চিরযুবক, এভারগৃন। যদিও বিয়ের পর আমি কিছুটা বুড়িয়ে গিয়েছি। তাই বলে সে যেখানে যাবে সেখানেই মহানায়ক হয়ে প্রেমলীলা চালাবে এটা তো আর মেনে নিতে পারি না। তাই তো তাকে বলে দিয়েছি, আবার যদি কোনো অঘটন ঘটাও তাহলে এবার নারী নির্যাতনের কেস ঠুকে দেবো।

মেহেরপুর থেকে

কোলাকুলি

তখন আমার পোস্টিং মফস্বলের এক শহরে। সপরিবারে উপজেলার একটা কোয়ার্টারে থাকি। দোতলার পূর্ব পাশের ফ্ল্যাট। অনতিদূরে আরেকটা কোয়ার্টার। ওই কোয়ার্টারের পশ্চিম পাশের ফ্ল্যাট অনেক দিন ধরে ফাকা। অর্থাৎ কারো নামে বরাদ্দ ছিল না।

একদিন সকালে জানালার পাশে দাড়িয়ে দাত ব্রাশ করছি। হঠাৎ দেখি ওই ফ্ল্যাটের বারান্দায় অপূর্ব এক সুন্দরী মহিলা দাড়িয়ে। চোখ নামাতে ইচ্ছা করছিল না। তবুও ভদ্রতার খাতিরে এবং স্ত্রীর ভয়ে অন্যদিকে চোখ ফেরালাম। অবশ্য আড়চোখে চুরি করে তাকানো অব্যাহত ছিল।

অফিসে গিয়ে ইঞ্জিনিয়ারের কাছ থেকে জানতে পেলাম জেলার এক নতুন ম্যাজিস্ট্রেট ঝিনাইদহ থেকে বদলি হয়ে এসেছেন। তাকে ওই ফ্ল্যাট বরাদ্দ দেয়া হয়েছে।

সুন্দরী মহিলাকে দেখে যতোটা খুশি হয়েছিলাম, স্বামী ম্যাজিস্ট্রেট শুনে সে খুশিটা কিছু কমে গেল। ভাবলাম, একজন ম্যাজিস্ট্রেটের বাসায় আমার মতো ছাপোষা কেরানির তো পারিবারিক সখ্যতা গড়ে তোলা সম্ভব নয়! হতোদ্যম হলেও চোখ দুটোকে শাসন করা সম্ভব হলো না। প্রতিদিন কাজে-অকাজে জানালার কাছে এসে দাড়াই আর তাকাই। ভদ্রমহিলাকে প্রায় দেখতে পাই। আমার কেন যেন মনে হয় সেও বারান্দায় আসে আমার প্রত্যাশায়। এটা নিশ্চিত হই এই ভেবে যে, সে বিনা কাজে বারান্দায় এসে দাড়িয়ে থাকে। তাছাড়া বুঝতে পারতাম, আমার চাকরিটা কম দরের হলেও চেহারা ও শরীরটা মোটেও কম দরের ছিল না। অন্তত মেয়েদের কাছে এর কদর অতীতে বহু পেয়েছি।

এভাবে জানালা আর বারান্দার অন্তরালে চার চোখে তাকাতে তাকাতে কেটে গেল কিছু দিন। এলো ঈদ। সিদ্ধান্ত নিলাম ঈদের সুযোগে বেড়াতে যেতে হবে। ঈদে বেড়াতে গেলে ম্যাজিস্ট্রেটের মনে করার কিছু থাকবে না। এবং একবার বেড়াতে যাওয়া মানে তো ইজি হয়ে যাওয়া!

ঈদের দিন এগারোটার দিকে বেরিয়ে পড়লাম। আমার গিন্নিকে বললাম, বন্ধু মহলে ঈদের শুভেচ্ছা জানিয়ে আসি, ফিরতে একটু দেরি হবে।

বেরিয়ে সোজা পাশের কোয়ার্টারে ঢুকে পড়লাম। দোতলায় উঠে কলিংবেল চেপে দিলাম।

ভাবী এসে দরজা খুলে দিলেন।

সালাম জানালাম।

ভাবীও মিষ্টি করে সালামের জবাব দিলেন।

সোফায় গিয়ে বসলাম। শুরু হলো আলাপ-পরিচয়। নাম-ধাম, পরিচয়, কি করা ইত্যাদি। এতো দিনে একবারও বেড়াতে আসা হয়নি কেন এমন অভিযোগও উঠে এলো।

আলাপের এক ফাকে জিজ্ঞাসা করলাম, স্যারকে দেখছি না যে?

ভাবী বললেন, তিনি নামাজ শেষে অন্য শহরে গেছেন বৃদ্ধ মাকে দেখতে। ফিরতে বিকেল হবে।

ভাবীর সঙ্গে বেশ কিছুক্ষণ কথা হলো। যতোক্ষণ কথা বলছিলাম, অপলক দৃষ্টিতে ভাবীকে শুধু দেখছিলাম। কি মিষ্টি চেহারা, মিষ্টি মিষ্টি কথা, হৃদয় কাড়া হাসি।

বিয়ে হয়েছে বছর দুয়েক। এখনো সন্তান হয়নি। স্লিম ফিগার। গায়ের রঙ দুধে-আলতা। ভারী নিতম্ব ছাড়িয়ে লম্বা কালো চুল। শিফন জর্জেটের একটা শাড়ি পরা। শাড়িটা গায়ের সঙ্গে লেপটে আছে। ফলে অবয়বটা স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে। বক্ষ বন্ধনীটাও স্পষ্ট চোখে পড়ছে।

ভাবী খাবার খেতে দিলেন। হরেক রকমের খাবার।

খাবার খেতে বসে একটু রসিকতা করে বললাম, ভাবীর সব কিছুই সুন্দর।

ভাবী হেসে দিয়ে বললেন, সব কিছু মানে?

বললাম, দেহ, মন, আসবাবপত্র, খাবার, আরো কতো কি।

ভাবী দুষ্টমির হাসি দিয়ে বললেন, তালিকায় প্রথমেই দেহ বললেন কেন?

দুষ্টমি করলাম, এমন দেহ আগে কোনোদিন দেখিনি যে!

ও, তাই বুঝি? ভাবী কথাটা বলে আবারও হাসলেন।

এভাবে কথা বলতে বলতে আমরা অনেক ফ্রি হয়ে গেলাম।

বেশি কিছু খাচ্ছি না দেখে ভাবী জোর করে দিতে উদ্যত হলেন।

হাত চেপে ধরে বললাম, এতো খেতে পারবো না। তাছাড়া ঈদের দিনে কি কেউ কারো বাড়ি খাবার খেতে আসে?

ভাবী বললেন, তবে কি জন্য আসে?

বললাম, ঈদের কোলাকুলি করতে। স্যার নেই, তাই কোলাকুলির আনন্দটাই মাটি হয়ে গেল।

ভাবী জড়তাহীনভাবে সঙ্গে সঙ্গে জবাব দিলেন, ঈদের আনন্দ মাটি হবে কেন? আমি তো আছি। আমার সঙ্গে কোলাকুলি করা যাবে না?

কথাটা শুনে আমার সমস্ত শরীরের কোষগুলো হিম হয়ে আসতে লাগলো। যা খেয়েছিলাম তা যেন পেটের ভেতর থেকে উঠে আসতে চাইলো। সমস্ত শরীর-মন কি এক আবেশে শিহরিত হয়ে উঠলো। এ আমি কি শুনলাম! ঠিক শুনেছি তো?

ভাবীর দিকে একবার তাকালাম।

ভাবীর চোখে মুখে এক বিশেষ আহ্বান লক্ষ্য করলাম।

খাওয়া শেষ করে উঠে দাড়ালাম। ভয়-জড়তা উপেক্ষা করে মনে সাহস সঞ্চয় করে বললাম, খাওয়া তো শেষ, বাকি রইলো কোলাকুলি। কই, দাড়িয়ে রইলেন যে?

ভাবী মন্ত্রমুগ্ধের মতো কাছে এলেন।

আমি বিদ্যুতের বেগে দুই হাত দিয়ে ভাবীকে বুকের মধ্যে জড়িয়ে ধরলাম। ভাবীর সুউন্নত বুক আমার বুকের সঙ্গে পিষে গেল।

এভাবে কতোক্ষণ জড়িয়ে ধরেছিলাম মনে নেই। দেখি আমিও কাপছি, ভাবীও কাপছেন।

আমার হাত দুটো ভাবীর পিঠে বিচরণ শুরু করলো। ব্রা-র ফিতের স্পর্শে আমার কাপুনি আরো বেড়ে গেল। আমার হাত ধীরে ধীরে পিঠ থেকে নিচে নামতে শুরু করলো। নিতম্বে গিয়ে আবার বিচরণ শুরু করলো। ততোক্ষণে শিফন ও জর্জেটের শাড়ির আচল উর্ধাংশ থেকে বিচ্ছেদ হয়ে গেছে।

তার মুখটা তুলে কমলার কোয়ার মতো ঠোট দুটোই আমার ঠোটে রাখলাম।

কতোক্ষণ জানি না...।

কোলাকুলির অর্ধেকটা হলো সোফায়। বাকি অর্ধেকটা সমাপ্ত হলো ভাবীর দামি বক্স খাটে। ঘণ্টা খানিক পর আমরা দুজনেই শান্ত হলাম। খাট থেকে উঠে দেখি, আমাদের দুজনের এক একটা বস্ত্র এক এক জায়গায় ছড়ায়ে-ছিড়িয়ে পড়ে আছে।

আমরা একত্রে বাথরুম সারলাম। বেরিয়ে এসে বস্ত্রগুলো কুড়িয়ে এনে পরে নিলাম।

বিদায়ের সময় ভাবী মিষ্টি একটা হাসি দিয়ে বললেন, ঈদের কোলাকুলির আনন্দ মাটি হয়নি তো?

বললাম, এমন কোলাকুলি একবার করলে কি সাধ মেটে?

নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক, সাতক্ষীরা থেকে

নতুন পাঞ্জাবি পুরনো শার্ট

- এম. শিহাব উদ্দিন ভূঞা

২০০২ সালের কোরবানির ঈদে আমার স্ত্রী ঈদ শপিংয়ের পুরো টাকা দিয়ে এলিফ্যান্ট রোডের *লংলা* থেকে আমার জন্য একটি পাঞ্জাবি নিয়ে আসে। দোকানে গিয়ে পাঞ্জাবিটা পছন্দ হওয়ার পর দাম দেখে বুঝতে পারে, এটি কিনলে অন্য কোনো কেনাকাটা করা যাবে না।

লংলা এক দামের দোকান।

তবু আমার স্ত্রী সেলসম্যানকে একাধিকবার রিকোয়েস্ট করে ফেললো একটু কমানোর জন্য।

এক পর্যায়ে সেলসম্যান বিরক্ত হয়ে বললো, আপনি এটা কিনতে পারবেন না।

কথাটি স্ত্রীর সেন্টিমেন্টে লেগে যায়। এক ঝটকায় সে ব্যাগ থেকে টাকা বের করে পাঞ্জাবিটা কিনে ফেলে।

অফিস শেষে বাসায় ফেরার পর সে আমাকে ঘটনাটি এভাবেই বললো।

সব শুনে বললাম, খুব ভালো করেছো। ঈদ শপিংয়ের টাকা তোমাকে আবার দেবো শুধু হেরে আসোনি বলে।

স্ত্রীর বার বার অনুরোধে পাঞ্জাবিটা গায়ে দিয়ে আয়নার সামনে গিয়ে দাড়ালাম। চমৎকার লাগছে।

মুহূর্তেই অনেক কথা মনে পড়ে গেল। বুকের ভেতর একটা চাপা কষ্ট অনুভব করলাম। পুরনো কিছু স্মৃতি স্ত্রীকে শোনালাম। পাঠকদেরও বলতে ইচ্ছা করছে বুকটা হালকা হবে এই আশায়, এমনকি বলা যায় না, আমার অভিজ্ঞতা কারো উপকারেও লাগতে পারে।

একজন গরিব প্রাইমারি স্কুল শিক্ষকের ঘরে আমার জন্ম। তিন ভাই, পাচ বোনের মধ্যে আমি ছিলাম সবার ছোট। আমি যখন ক্লাস থৃ-তে পড়ি তখন বাবা রিটায়ার করেন। বড় ভাইদের সঙ্গে আমার বয়সের তফাত ছিল বিস্তর। সবার ছোট হলে নাকি অনেক আদর পাওয়া যায়। তবে সেটা শোনা কথা মাত্র।

বাবা ছিলেন অত্যন্ত নির্লিপ্ত ধরনের মানুষ। তিনি আদরও করতেন না আবার বকাঝকাও দিতেন না। আমাকে ছোটবেলা কোনোদিন কোলে নিয়েছেন কিংবা বড় হওয়ার পর শাসন করেছেন এ কথা আমার মাও মনে করতে পারেননি।

বাবা আজ বেচে নেই। আল্লাহ্ আমার পরম শ্রদ্ধেয় বাবাকে বেহেশত নসিব করুক।

তবে মা আদর করেছেন। কিন্তু অত্যন্ত রাগী মানুষ বলে সব সময় তা উপলব্ধি করতে পারিনি। সবচেয়ে বেশি কষ্ট পেয়েছি আমার বড় দুই ভাইয়ের কাছ থেকে। বড় দুই ভাই, বিশেষ করে মেজ ভাইয়ের প্রচণ্ড রকমের দুর্ব্যবহারের ফলে তাদের যে ভয়ংকর চিত্র আমার কচি মনে আকা হয়েছিল, শত চেষ্টা করেও তা আজও মুছতে পারিনি। শুধু মেজভাইকে দোষ দিয়ে লাভ নেই। প্রায় সকলের কাছেই ছিলাম অনেকটা অপাংক্তেয়, অবাঞ্ছিত, অযাচিত। *কাবাব মে হাড্ডি*। গায়ের রঙ কালো আর বোকা-সোকা ছিলাম বলে আমার কপালে

কিল, চড়টা লেগেই থাকতো। আমার মা ছাড়া আমাকে কেউ কখনো আদর করে ডাক দিয়েছেন এমন কথা স্বপ্নেও মনে করতে পারি না।

যখন চাকরিতে যোগ দিই তখন আমার বয়স ছিল চব্বিশ। এ চব্বিশ বছরের জীবনে প্রায় আটচল্লিশটি ঈদ পার করেছি। কিন্তু কোনো ঈদে আনকোরা নতুন একটা জামা গায়ে দিয়েছি এ রকম কথা আমার শত্রুও বলতে পারবে না।

যখন ক্লাস ফাইভে পড়ি তখন হাটু পর্যন্ত লম্বা কমলা রঙের একটি পুরনো শার্ট আমাকে দেয়া হয়েছিল। ক্লাস এইট পর্যন্ত ওটাই আমার একমাত্র সম্বল ছিল। বহুল ব্যবহারের ফলে অত্যন্ত মলিন ও বিবর্ণ শার্টটি আজও আমার স্মৃতিতে উজ্জ্বল। গ্রামের স্কুলে পড়েছি বিধায় প্যান্টের বালাই ছিল না। কিন্তু যখন কলেজে ভর্তি হয়েছি তখন প্যান্ট পরতেই হলো। একটি শাদা শার্ট, একটি খাকি প্যান্ট ও একটি টি-শার্ট ছিল আমার স্থাবর-অস্থাবর সম্পত্তি। রাতে ধুয়ে সকালে আধভেজা প্যান্ট পরেছি বহুদিন। পরিধানের অনুপযুক্ত হওয়ার জন্য বড় ভাই যে শার্ট ফেলে দিতেন সেটিই পরম যত্নে গায়ে দিয়ে গ্র্যাজুয়েশন করেছি।

ভাইদের তুলনায় আমি ছিলাম অতিশয় শীর্ণকায়। ফলে তাদের পরিধেয় শার্ট গায়ে দিলে সে কিম্ভূতকিমাকার অবস্থার সৃষ্টি হতো তা বর্ণনাতীত। ডিঙি নৌকায় বিশাল আকৃতির পাল খাটালে যে রকম, অনেকটা সে রকম।

মাস্টার্স পড়া অবস্থায় আমার এক সহপাঠীর সহযোগিতায় একটি প্রাইভেট প্রতিষ্ঠানে অতি সাধারণ পদে একটি চাকরি পাই। সততা, কাজের প্রতি একনিষ্ঠতা আর ব্যাপক পরিশ্রমের ফলে অনেক দূর এগিয়ে যাই।

দীর্ঘ পরিশ্রমের পর সৃষ্টিকর্তার মহান কৃপায় আজ আমি প্রতিষ্ঠিত। প্রতি ঈদে আমি যে পরিমাণ টাকা বেতন ও বোনাস পাই তা অনেকের কাছেই ঈর্ষণীয় মনে হবে। কিন্তু নিয়তির পরিহাস, আজ ঈদ উপলক্ষে নতুন জামা গায়ে দিতে ইচ্ছা করে না। শেরাটন, সোনারগাও বা রাজধানীর অভিজাত রেস্টুরেন্টগুলোতে এতো খেয়েছি যে, আজ আর কোনো ভালো খাবারের কথা মনে হলে জিভে পানি আসে না। আজ যখন আমার আত্মীয়স্বজনের বাড়ি বেড়াতে যাই তখন আমার প্রতি তাদের আদর-আপ্যায়ন দেখে অতীত দিনগুলোর কথা মনে পড়ে যায়।

সকালে নাশতা না খেয়ে ফাইনাল পরীক্ষা দেয়া আমার জন্য ছিল মামুলি ব্যাপার। ঈদের দিনে আমার বয়সী সকলে যখন নতুন জামা গায়ে দিয়ে খেলায় মেতে উঠতো তখন ম্রিয়মাণ হয়ে এক কোণায় দাড়িয়ে থাকতাম। ছোটবেলায় আত্মীয়স্বজনের বাড়ি বেড়াতে গেলে ছোটরা আমাকে প্রায়ই প্রশ্ন করতো, তুমি এটা পরে এসেছো কেন, জানো না বেড়াতে এলে ভালো কাপড় পরে আসতে হয়?

বহু পরিশ্রম করে আজ যে অবস্থানে এসেছি তাতে আমি সুখী, মহা সুখী।

নাম ঠিকানা প্রকাশে অনিচ্ছুক

অকাল বিধবা

- এস.এম. আছাব আলী

কোনো ব্যথিত মানুষ দেখলে আমার কৌতূহল হয়। কি পারিবারিক, কি সামাজিক, কি ব্যক্তি বিশেষের জীবন সমস্যার যতোটুকু পারি শুধু বেদনার বিবরণ, দুঃখের কাহিনী, অবিচারের মর্মান্তিক জ্বালার কথাই লিখি।

গত জানুয়ারি মাসে ঢাকায় মেয়ের বাসায় বেড়াতে গিয়েছিলাম। ছয় বছরের নাতনি ঐশীকে মিরপুর এলাকায় এক ইংলিশ মিডিয়াম স্কুলে ভর্তি করে দেয়া হয়েছে। যে কয়দিন ঢাকায় ছিলাম, ঐশীকে স্কুলে আনা-নেয়ার দায়িত্ব নিলাম।

স্কুলটি বেশ বড় এবং ভালো। ও লেভেল পর্যন্ত পড়ানো হয়। সকাল সাড়ে আটটা থেকে দুপুর সাড়ে বারোটা পর্যন্ত ঐশীর ক্লাস চলে। ঐশীকে ক্লাস–রুমে পৌছে স্কুলের বারান্দার নিচে খেলার মাঠে রৌদ্রে পিঠ দিয়ে একটা প্লাস্টিকের চেয়ারে বসে দৈনিক পত্রিকা পড়ে চার ঘণ্টা সময় কাটাতাম। অনেক মায়েরা দেখতাম দল বেধে বসে গল্প করে সময় কাটাচ্ছেন। শুধু এক মেয়েকে দেখতাম একা আনমনে বসে সময় কাটাচ্ছে। কেন জানি না, তাকে আমার ব্যথিত এবং নিঃসঙ্গ বলে মনে হলো।

একদিন ক্লাস শুরুর আগে দোতালার সিড়ির গোড়ায় তার সঙ্গে পরিচিত হলাম। তার ছেলে ঐশীর সঙ্গে পড়ে। এরপর প্রতিদিন চার ঘণ্টা আমরা একত্রে বসে পত্রিকা পড়ে, গল্প করে সময় কাটাতে লাগলাম। আমাদের মাঝে পিতা ও কন্যার মতো একটা সম্পর্ক গড়ে ওঠে। কম বয়সী এই মহিলাটি ছিল স্বপ্নহীন, জীবনবিমুখ, বিষণ্ন ও ব্যথিত। ধরা যাক তার নাম রোকেয়া।

রোকেয়া গাড়িতে করে আমার আগেই স্কুলে এসে পৌছাতো। রিকশা থেকে নেমেই তাকে দেখতাম। সকালবেলা একটা হালকা দীপ্তি যেন তাকে ঘিরে থাকে। বলতাম, মামণি, আজকে তোমার মনটা কি খুব বেশি খারাপ?

সে স্মিত হেসে মাথা নেড়ে বলতো, না।

জানতাম, তার এই না উত্তরটি সত্য নয়। সে খুব শালীন পোশাক পরতো। কম কথা বলতো। নিজেকে অন্যের কৌতূহলি চোখ থেকে আড়ালে রাখার চেষ্টা করতো। বুঝতে পারতাম এক রহস্যময় বেদনার আবরণে সে আচ্ছাদিত।

মানুষ বিভিন্নভাবে কষ্ট পায় এবং কষ্ট দেয়। কারো সীমারেখা একরূপ নয়। আমার এ জন্য কষ্ট হতো যে, সে তার ব্যক্তিগত বিষয়গুলো গোপন রাখতো। তার ছেলের নাম নাঈম।

সে আমাকে শুধু এতোটুকুই বলেছিল যে, নাঈমের বাবা একজন বড় ব্যবসায়ী এবং বর্তমানে বিদেশে।

যাহোক, সময় একদিন শেষ হলো। আমার বাড়ি ফেরার দিন হলো। স্কুলটি শুক্র ও শনিবার বন্ধ থাকে। এক বৃহস্পতিবার গল্প শেষে তাকে বললাম, মামণি, আগামীকাল আমি বাড়ি যাবো। আবার কবে ঢাকায় আসবো জানি না। তাছাড়া বৃদ্ধ মানুষ, মারাও যেতে পারি। আমার প্রার্থনা রইলো, তোমার সমস্ত আকাঙ্ক্ষার জগৎটার মধ্যে কোথাও যেন কোনো অশান্তি না থাকে।

মনে করেছিলাম গল্পটা এখানেই শেষ হবে। কিন্তু রোকেয়া তার গল্পটা যে আরো দীর্ঘ করবে তা আমার জানা ছিল না।

মনে আছে, সেদিন স্কুল ছুটির ঘণ্টা বেজে উঠলো। শিশুরা সিড়ি বেয়ে নিচে নেমে এলো। আমরা যে যার শিশুর হাত ধরলাম। স্কুল গেট থেকে একটি সরু বাকা রাস্তা বড় রাস্তায় এসে ঠেকেছে। সেই সরু রাস্তায় আমরা অল্পক্ষণ পাশাপাশি হাটলাম। দুই পাশে কাঠের বড় বড় আড়ত।

রোকেয়া তার গাড়ির কাছাকাছি এসে থামলো। খুব ক্ষীণ কণ্ঠে আমাকে বললো, চাচাজান, আপনাকে মিথ্যা বলেছি, ক্ষমা করবেন। আমি বিধবা। খুব দ্রুত সে গাড়িতে উঠে মাথা নত করলো।

তার গাড়ি চলতে লাগলো। আমি নির্বাক চেয়ে রইলাম।

আমি রোকেয়ার কেউ নই। এ কয়েকদিনে তার খুব কাছাকাছি এসে গিয়েছিলাম। আমি তার জন্য প্রার্থনা করেছিলাম, তার মনের ভেতর কোথাও যেন কোনো অশান্তি না থাকে। কিন্তু পৃথিবীতে শান্তি প্রতিষ্ঠা করার কাজটি খুবই কঠিন। সংসারে এতো লোকের এতো কাজ, এতো দুঃখ–কষ্ট, এতো সমস্যা, তবু মনে হয় আমার সমস্যা, আমার দুঃখের বুঝি কোনো তুলনা নেই।

সে যে বিধবা এ কথা শোনার পর মনে হলো, এ কয়েকদিনে জমানো সব বিশ্বাস, সব আকর্ষণ, সব প্রার্থনার মূল ধরে কে যেন টান দিল। রোকেয়া যেন সব সম্পর্কের সূত্র নিশ্চিহ্ন করে আমাকে একেবারে নিরাশ্রয় করে রাস্তায় ছেড়ে গেল। আমি আমার বাড়ি ফেরার তারিখ বদলানোর সিদ্ধান্ত নিলাম।

রবিবার সকাল সাড়ে আটটায় স্কুলের দোতলার সিড়ির গোড়ায় রোকেয়ার সঙ্গে আবার দেখা হলো। ঐশী–নাঈম সিড়ি বেয়ে তাদের ক্লাসে গেল। আমরা খেলার মাঠে মুখোমুখি বসলাম।

বললাম, জীবন যেমন উত্তেজনাময় তেমনি কষ্টে ভরা। মামণি, আমি জানতাম না তুমি বিধবা। কিন্তু জানার পর তোমার প্রয়াত স্বামীর বিষয়ে জানতে খুব ইচ্ছে করছে।

খুবই নাটকীয়ভাবে আমাদের বিয়ে হয়েছিল। রোকেয়া বললো।

আবারও দীনতা, মৌনতা। আমাকে বলতে না পারার জড়তা তাকে ম্রিয়মাণ করছে। বললাম, তোমার কষ্ট হলে বলো না।

সে বললো, যতো কষ্টই হোক, আপনাকে বলবো।

নাঈমের বাবার নাম জাফর। জাফরের দাদা ছিলেন গ্রামের সেরা ধনী। তার বাবা চামড়া ব্যবসায়ী। হাজারীবাগে তাদের বড় ট্যানারি আছে। এই ধনী এবং ব্যবসায়ী পরিবারটি ঢাকার স্থায়ী বাসিন্দা হলেও বছরে দুটো ঈদ তারা গ্রামের বাড়িতে করে সেই শুরু থেকে এবং এখনো করছে। কি গ্রামের মানুষের কাছে, কি আত্মীয়স্বজনদের কাছে, কি চেনা–অচেনাজনের কাছে তারা এতো ভালো যে, তাদের বিরুদ্ধে কোনো কথা চলে না।

একই গ্রামে আমার বাবা ছিলেন একজন গরিব মানুষ। তিনি গাভী পুষতেন, দুধ বিক্রি করে আমি ও আমার ছোট দুই ভাইদের আহার যোগাতেন। কিন্তু এতো কিছু বলার আগে আপনাকে আমার কৈশোরে ঘটে যাওয়া একটা ঘটনা বলা প্রয়োজন।

সেই জানুয়ারি মাসের মাঝামাঝি সময়ে রোকেয়ার কাছে তার কিশোর মনের যে নিষ্ঠুর অভিজ্ঞতার কথা শুনেছি, এই সেপ্টেম্বর মাসে তা লিখতে বসে মনে কষ্ট অনুভব করছি।

রোকেয়া তখন ক্লাস ফাইভের ছাত্রী। রোকেয়া একদিন দুই কিলোমিটার দূরে তার ছোট খালার বাড়িতে বেড়াতে যায়। তার খালু তাকে আদর করার ছলে তার ওপর বলাৎকার করেন। সে ছাড়া পেয়ে এক দৌড়ে কাদতে কাদতে বাড়ি এসে তার মাকে সব বলে দেয়।

শুনে রোকেয়ার মাও প্রথমে কাদতে থাকেন এবং তাৎক্ষণিক রোকেয়ার হাত ধরে তার বোনের বাড়ি রওনা দেন।

বাড়ির কাছাকাছি রোকেয়ার খালু পথ আটকে দাড়ান। তিনি তার ভুল স্বীকার করেন। রোকেয়ার মায়ের কাছে হাত জোড় করে ক্ষমা প্রার্থনা করেন এবং বিষয়টা গোপন রাখার অনুরোধ জানান।

কিন্তু রোকেয়ার মা তখন রাগে অগ্নিশর্মা, সে তার ছোট বোনের কাছ নালিশ জানায়। রোকেয়ার মা কাজটা ভুল করেছিল। ফলে ভবিষ্যৎ জীবনে রোকেয়া ও তার খালার জীবনে এক ভয়াবহ পরিণাম নেমে আসে।

রোকেয়া বলেছিল, জীবনের শুরুতেই দেখেছি যৌবনের কাছে মানুষের অসহায়ত্ব। সেই কিশোরকালের কথা, সেই লাঞ্ছনার কথা মনে হলে ভীষণ রকম পীড়িত ও ব্যথিত হই। প্রকাণ্ড একটা অভিশাপ, সীমাহীন একটা গ্লানি আমাকে কুরে খায়।

রোকেয়া চোখ মুছে নিয়ে বললো, তখন থেকেই আমার মনে হতে থাকে কোনো পুরুষেরই উন্নত ধরনের চিন্তা ও মন নেই। আমার এ ক্ষুদ্র জীবনে পুরুষের আচরণের প্রতি খুবই ঘৃণা ভাব এসে যায়। লেখাপড়ায় মনোনিবেশ করি। ১৯৯৩ সালে এসএসসি পাস করে স্থানীয় কলেজে ভর্তি হই।

১৯৯৫ সালের এপৃল মাস। গ্রামে খুব ধুমধাম চলছে। জাফরের বিয়ে। আগেই বলেছি, গ্রামে মানুষের কাছে এ পারিবারটি খুবই প্রিয়। প্রতি ঈদে তারা গ্রামের মানুষদের আনন্দ শেয়ার করে। আর বিয়ের আনন্দ আলাদা। জাফর গ্রামের মেয়ে পছন্দ করে। ভিন্ন এক গ্রামে তাদের এক আত্মীয় কন্যার সঙ্গে বিয়ে। নির্দিষ্ট দিনে বাস-কার-মোটর সাইকেলের শব্দে ফুলতলা গ্রামের আকাশ-বাতাস মুখরিত। ডেকোরেটর এসেছে, বাবুর্চি-মশালচি এসেছে। দেড় হাজার লোকের মেনু তৈরি করা হয়েছে। বাস ভর্তি বরযাত্রী গেল, আগামীকাল বৌভাত। রাত দুটায় গরু-ছাগল জবাই করা হলো। খাওয়া-দাওয়ার সব অ্যারেঞ্জমেন্ট যেন সঠিক সময়ে হয়। কিন্তু রাত তিনটায় বৌ ছাড়া বরযাত্রীরা ফিরে এলো। গ্রামের মানুষদের মাঝে যেন একটা শোকের ছায়া নেমে এলো।

রোকেয়া বললো, আসলে বিয়েতে নারীদের কোনো সুখ নেই আবার বিয়ে ছাড়া তাদের কোনো বিকল্প সুখও নেই। যদিও চিন্তায় ছিল জীবনে কখনো বিয়ে করবো না। কিন্তু প্রকৃতি, পরিবেশ ও পরিস্থিতির কারণে পরদিন আমাদের জীবনে কি ঘটতে যাচ্ছে আমরা জানি না।

সেদিন সেই ভোর রাত চারটার সময় আমাকে ঘুম থেকে ডেকে তোলা হলো। চোখ ঘষতে ঘষতে দেখলাম সামনে আমার ও জাফরের মা-বাবা দাড়িয়ে।

মা বললেন, তারা এসেছেন, জাফরের সঙ্গে তোর বিয়ে মা।

মা আমার হাত জাফরের মায়ের হাতে তুলে দিলেন।

আমি হ্যা বা না কিছুই বলতে পারলাম না।

বিয়ে বাড়িতে আবারও আনন্দ শুরু হলো।

গোসল করে জায়নামাজে বসলাম।

ফজরের নামাজের পর জাফরের বাড়িতেই মেয়েরা আমাকে সাজাতে লাগলো।

তাদের দেয়া গয়নাগুলো আমার শরীরে ভার ভার লাগছিল। আমি বুঝতেই পারলাম না, বেশি গয়না হলে মেয়েরা কেন বেশি খুশি হয়!

জাফরের একটা সুন্দর গাড়ি ছিল। সেদিন বিকেলেই সেই গাড়িতে করে আমরা ঢাকায় রওনা হলাম। ফুলশয্যা ঢাকাতেই হবে। ঢাকাতে আসার পথে মনে মনে প্রার্থনা করেছিলাম, যদি কোনো দুর্ঘটনা হয় তাহলে যেন আমার মৃত্যু হয়। কি আশ্চর্য! ঈশ্বর মানুষের প্রার্থনা কখনো কখনো গ্রহণ করে। তবে তা ভিন্নরূপে।

বাসর রাতে সে আমর ঘোমটা খুলে প্রথম বললো, তুমি সুন্দর!

আমার হৃদয় কেপে উঠলো, চোখের পাতা ভিজে গেল। পুরুষের প্রতি আমার মনে যে গভীর ঘৃণা ছিল তা প্রথম রাতে মন থেকে মুছে গেল।

আমাকে বিয়ে করার রহস্য জাফরের কাছেই জানলাম। যে মেয়েটিকে সে বিয়ে করতে গিয়েছিল, ওই রাতেই সে তার প্রেমিকের হাত ধরে পালিয়েছিল।

জাফর আমাকে বলেছিল, বিয়ে এক ধরনের মিস্টিক, স্বর্গীয় বা মরমী সংযোগ যা নিছক দৈহিক নয়, এটা এক বিশেষ বন্ধনের পরিচায়ক।

আমার নিজের জীবনের দুঃখ-কষ্টের এখনো কোনো শেষ নেই। অনেক ইচ্ছা এখনো অসমাপ্ত ও অসুন্দর রয়ে গেছে। তা সত্ত্বেও কম বয়সী এই বিধবা মেয়েটির কথা শুনতে শুনতে নিজের কথা ভুলে গিয়েছিলাম।

রোকেয়া বললো, ফুলের সৌরভ, আকাশের নীলিমা, চাদের আলো, বিন্দু বিন্দু শিশির আরো অনেক কিছু মানুষের ভালো লাগে। কিন্তু নিজের স্বামীকে যে সব কিছুর চেয়ে বেশি ভালো লাগে তা সেই প্রথম জানলাম।

আমাদের দাম্পত্য জীবনের তিনটা বছর খুব সুন্দরভাবে কেটে গেল এবং আমি গর্ভবতী হলাম। পরিবারে আনন্দের ঢল নামলো। কিন্তু এমন সময় জাফরের কাছে একটি বেনামি চিঠি আসে যা ছিল আমার জন্য মর্মান্তিক।

চিঠিতে আমার নামে খুবই বাজে ও অসত্য কথা লেখা ছিল। জাফর এ নিয়ে কয়েকদিন আমাকে খুব প্রশ্ন করে এবং যাচাই করে।

আমি অনুভব করতে পারি একটা অসত্য বিষয় নিয়ে সে কষ্ট পাচ্ছে। তার মনকে হালকা করার জন্য খালুর ঘটনাটা বলি।

সে আরো উদাস হয়ে পড়ে। আমাকে প্রশ্ন করে, এ ঘটনা আমাকে আগে বলোনি কেন?

তুমি আমাকে অত্যন্ত ভালো জেনে বিয়ে করেছো, তাই বলিনি। এ ঘটনা তোমার হৃদয়কে আঘাত করতো।

তাহলে আরো কিছু আছে যা বলছো না।

তাকে খুব আদার করলাম, বোঝালাম এবং বললাম, মিছেমিছি জীবনটাকে এতো জটিল করে কি লাভ! আমার মাঝে আর কোনো প্রকার ভেজাল নেই।

সে আমাকে বিশ্বাস করতো। কিন্তু ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অবিশ্বাস তাকে কষ্ট দিতো। হয়তো ভুল বললাম, সে আমাকে ভীষণ ভালোবাসতো। এবং এ ভালোবাসার কারণেই সে আমার প্রতি উদাস হয়ে পড়লো। আমি যতোই তাকে কাছে টানি, সে আমাকে ততোই দূরে ঠেলে। আমার কিশোর জীবনের একটি অনাকাঙ্ক্ষিত ঘটনা আমার স্বামীর হৃদয়কে ভেঙে টুকরো টুকরো করে দিল। মানুষের পৃথিবীতে এমনি করেই কি সর্বত্র অন্তরে হাহাকার আর বাইরে ছদ্মবেশের প্রলেপ!

ঘড়িতে দুপুর বারোটা বাজলো। আমার মনে হলো, কথা বলতে বলতে রোকেয়া ক্লান্ত হয়ে পড়েছে। তার বুকের ভেতর কান্নাগুলো বড় বড় নিঃশ্বাসের আড়ালে লুকানোর চেষ্টা করছে। বললাম, থাক মা, বাকিটুকু পরে শুনবো।

না, কথা শেষ হয়ে গেছে। নাঈম ভূমিষ্ঠ হবার আগেই জাফর তার সেই সুন্দর গাড়িটি নিয়ে দুর্ঘটনার শিকার হয়। ঢাকা মেডিকাল কলেজ হাসপাতালে ইনটেনসিভ কেয়ার ইউনিটে তিন দিন অজ্ঞান থাকার পর মারা যায়।

স্কুল ছুটির ঘণ্টা বেজে উঠলো। এখনি বাচ্চারা দোতলা থেকে নিচে নেমে আসবে। আমরা উঠে দাড়ালাম।

রোকেয়া তার চোখ দুটি মুছে নিয়ে বললো, প্রথম জীবনের হিসাব আমাকে সারা জীবন টানতে হবে। তার সঙ্গে পুনরায় পরলোকে মিলিত না হওয়া পর্যন্ত বিধবা থাকতে চাই।

রোকেয়া তার গাড়ি নিয়ে দক্ষিণ দিকে চলে গেল।

আমি ঐশীকে নিয়ে রিকশায় উঠলাম। রিকশার হুড তুলে দিয়ে ঐশীর হাত আরো শক্ত করে চেপে ধরে ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা জানালাম, আর কোনো শিশুকে যেন রোকেয়ার মতো লাঞ্ছিত হতে না হয়, আর কোনো স্ত্রীকে যেন রোকেয়ার মতো অকাল বিধবা হতে না হয়।

বড়গাছা, জয়পুরহাট থেকে

পার্স

- আসফিয়া আহাসান

এ বছরের এপৃল মাসের কথা। রিকশা করে কলেজ থেকে ফিরছিলাম। হঠাৎ করেই একটা মোটর সাইকেল ওভারটেক করে রিকশার পথ রোধ করে দাড়ালো। জিনস আর টি শার্ট পরা এক যুবক এগিয়ে এলো। চোখ দুটো কালো সানগ্লাসে ঢাকা। অজানা আশংকায় কেপে উঠলো মন। প্রায় নির্জন পথে সাহায্য পাওয়ার তেমন কোনো আশাই নেই।

সামনে এসে দাড়িয়ে হাত বাড়িয়ে দিয়ে বললো, আপনার পার্স।

অবাক হয়ে দেখলাম তার হাতে কোনো অস্ত্র নয়, আমার হ্যান্ডব্যাগ। নিশ্চয় রিকশা থেকে পড়ে গিয়েছিল। কাপা হাতে ব্যাগটা নিলাম। তখনো পুরো ধাতস্থ হতে পারিনি। মোটর সাইকেল স্টার্ট দিয়ে চলে গেল যুবক। তখনই খেয়াল হলো ভদ্রলোককে একটা ধন্যবাদও দেয়া হয়নি। নিজেকে ভীষণ ছোট মনে হলো। আমার জানা নেই তিনি যায়যায়দিন পড়েন কি না। যদি এ লেখা তার চোখে পড়ে তাহলে তাকে ধন্যবাদ এবং ক্ষমা প্রার্থনা বিলম্বিত ধন্যবাদের জন্য।

কিন্তু একটা চিন্তা আমার মাঝে উকি দিয়ে যায়।

আমি যদি সাহায্যের জন্য চিৎকার করে উঠতাম তাহলে কি ঘটতো? ভাগ্যিস, আতংকে আমার বুদ্ধি একেবারেই লোপ পেয়েছিল। না হলে ভীষণ বিশ্রী এক পরিস্থিতি তৈরি হতো।

আগ্রাবাদ, চট্টগ্রাম থেকে